



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

হরিশংকর জলদাসের গল্পবিশ্ব

ড. মহর্ষি সরকার^১

বাংলাদেশের ব্রাত্যজন ও প্রান্তিকজীবনকে নিয়ে নিবিড়ভাবে যিনি সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন তিনি হলেন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার হরিশংকর জলদাস (জন্ম— ১৯৫৫)। ব্রাত্যসমাজে জন্ম বলে খুব ছোটবেলা থেকেই সমাজের প্রান্তমানুষদের একেবারে কাছ থেকে দেখে বড়ো হয়েছেন। তাই তাঁর গল্পে সমাজের বিবর্ণ, অবহেলিত, রক্তক্ষরিত, বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত-বিপন্ন মানুষের হাহাকার-আর্তনাদ বারবার ফুটে উঠেছে। উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনজীবিকার কথা। খুনি, পাগলি, মুচি, মেথর, কোটনা, দালাল, নিচু স্তরের জেলে, শিক্ষক, গৃহিণী, দোকানদার, শিক্ষিত লোক, এমনকি মান্যগণ্য ব্যক্তিরও তাঁর গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি উঠে এসেছে সমকালীন বাংলাদেশের আধুনিক জীবনযাত্রার কথাও। তাই তাঁর গল্পগুলি প্রধানত চলতি জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, হিংসা-ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমাজ-সংসার, রাজনীতি এবং নানা বিষয়ের উপস্থাপনায় আধুনিক বাস্তববাদী শিল্প ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক ও সংকটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁর গল্পে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান আধুনিক কথাসিল্পে তা অপরিহার্য বিষয়।

দুই.

চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের অতি সাধারণ এক জেলে পরিবারে ১৯৫৫ সালের ১২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন হরিশংকর জলদাস।^২ ব্রাত্যসমাজ থেকে উঠে আসা এই কথাসাহিত্যিক সামাজিক অপমানের জ্বালা মেটাতে মধ্যবয়সে এসে লিখতে শুরু করেছিলেন এবং আজও লিখে চলেছেন। বহুবিধ অভিজ্ঞতায় জীবন আজ তাঁর পরিপূর্ণ। তাই কথাসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা ফুটে উঠেছে বারবার।

তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল যথাক্রমে— জলদাসীর গল্প (২০১১), লুচা (২০১২), হরকিশোরবাবু (২০১৪), কোনো এক চন্দ্রাবতী (২০১৫), মাকাল লতা (২০১৫), চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত (২০১৬), কাঙাল (২০১৬) প্রভৃতি। এছাড়াও তাঁর মোট ৩৯ টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে গল্পসমগ্র-১ (২০১৬)।^৩

তাঁর উপন্যাসগুলি হল যথাক্রমে— জলপুত্র (২০০৮), দহনকাল (২০০৯), কসবি (২০১১), রামগোলাম (২০১২), মোহনা (২০১৩), হৃদয়নদী (২০১৩), আমি মৃণালিনী নই (২০১৪), প্রতিদ্বন্দ্বী (২০১৪), এখন তুমি কেমন আছো (২০১৫), সেই আমি নই আমি (২০১৬), একলব্য (২০১৬), অর্ক (২০১৭), রঙ্গশালা (২০১৭), ইরাবতী (২০১৭) প্রভৃতি।^৪

দেশের নানা প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক হরিশংকর জলদাসের এ পর্যন্ত অনেকগুলি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হল— কবিতা ও ধীরজীবনের কথা (২০০১), কবি অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং (২০০২), লোকবাদক বিনয়বাঁশী (২০০৪), জীবনানন্দ ও তাঁর কাল (২০০৫), কৈবর্তকথা (২০০৯), বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠ (২০১১), নিজের সঙ্গে দেখা (২০১২), আমার কর্ণফুলী (২০১৬), জলগদ্য (২০১৭) প্রভৃতি।^৫

এছাড়াও ছোটগল্পে নিম্নবর্ণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গনামেও তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন উন্নয়নে থিয়েটার নামে স্বল্পশিক্ষিত জেলেদের লেখা একটি নাটকের বই। ২০০৭ সালে নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজীবন শীর্ষক গবেষণার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ. ডি উপাধি লাভ করেছিলেন।^৬

তিন.

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এক পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও এক তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি— দাম্পত্য সংকটের এই অতিপরিচিত ছবিকে কেন্দ্র করে ছোটগল্পকার হরিশংকর জলদাস যেমন গল্প লিখেছেন, তেমনি এই চেনা ছবির বাইরেও যে আরও অসংখ্য কারণ রয়েছে তা নিয়েও গল্প লিখেছেন। যদিও তাঁর গল্পে ‘তৃতীয় পক্ষ’ সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরিবেশিত হয়েছে। আর এরকমই কয়েকটি নিদর্শন নিয়ে আমরা মানব মনের জটিল গতিবিধিকে দেখার চেষ্টা করব। তবে শুধুমাত্র নষ্ট দাম্পত্যের ছিন্ন বন্ধনের ছবিই নয়, দাম্পত্য সম্পর্কের বহিরঙ্গের আবরণকে উন্মোচিত করে খুঁজে আনার চেষ্টা করা হবে নারী-পুরুষের ভিতরের আসল সম্পর্কে। একইসঙ্গে আমাদের সামনে উঠে আসবে বাংলাদেশের সমকালীন সমাজচিত্রও। আর সেইজন্যই সমকালীন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে লেখা হরিশংকর জলদাসের বেশ কিছু ছোটগল্প নিয়ে আমাদের এই প্রস্তাবনা।

প্রথমেই ‘লুচা’ গল্পটির নাম করা যায়। মননধর্মী এই গল্পের আখ্যানটি বেশ আকর্ষণীয়। সদ্য বিবাহিত দাদা সুধামের বিদেশ যাত্রার সুবাদে তাঁর সহধর্মিণী সূচিয়ার একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে স্নেহের ভাই স্বপন গড়ে তোলে শারীরিক সম্পর্ক এবং বাড়ি ফিরে এসে এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারায় সুধাম। সকলের কাছে পাগল বলে প্রতিপন্ন হয়। এভাবেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এক দম্পতির মধ্যে তাঁর ভাইয়ের আগমন তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে চিরতরে নষ্ট করে দেয়।

১. সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

DOI Link (Crossref) Prefix: <https://doi.org/10.63431/AIJTR/3.V.2026.20-32>

AIJTR, Volume 3, Issue –V, September - October, 2026, PP.20-32

Received on 1st September, 2026 & Accepted on 11th September, 2026,

Published: 15th September, 2026.

The statement “Copyright © by Author” (The author retains the copyright to the published article.)



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

গল্পের শুরুতেই আমরা দেখতে পাব মানসিক ভারসাম্যহীন সুধামকে। সে কোনোভাবেই তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া এই কঠোর বাস্তবকে মেনে নিতে পারেনি। তাই কখনো একা, আবার কখনো মানুষ বা কোনও কুকুর বা বাদামগাছকে সামনে পেলেও সে তাঁর যন্ত্রণার কথা জানিয়েছে। বিদেশ থেকে কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ এবং তাঁর স্ত্রীর শরীর সবটাই ভোগ করেছে তাঁর ভাই স্বপন। আর এই নির্মম সত্যকে সহ্য করতে না পারে সুধাম একসময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ভাই অন্ত প্রাণ সুধাম চেয়েছিল সংসারটা দাঁড় করাতে। তাই অসুস্থ বাবাকে কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সুধাম নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিল সংসারের দায়িত্ব। ভাইয়ের স্বপ্নপূরণের জন্য সুধাম নিজের পড়াশুনা স্থগিত রেখে পুরোদমে বাবার দোকানে গিয়ে বসেছিল। কিছুদিন পরে বাবা গত হলে সুধামের মনে বিদেশে গিয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করার ইচ্ছে জেগে উঠল। অন্যদিকে মা উতলা হয়ে উঠলেন সুধামের বিয়ে দেওয়ার জন্য। একদিন তেলকাজলা বৌ সুচিত্রার সঙ্গে বিয়ে হল সুধামের। বিয়ের চার মাস পরেই সুধাম কুয়েত পাড়ি দিল।

সুধাম চলে যাওয়ার পরেই সুচিত্রার মধ্যে দেখা দিল একাকীত্ব। একেবারে মনমরা, উদাস হয়ে যায় সে। শাশুড়ি মন খারাপ করতে নিষেধ করে এবং বিদেশ থেকে আসা সুধামের উপার্জিত টাকায় গয়না কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। কিন্তু—

গয়নার প্রলোভনেও সুচিত্রার মন জাগে না। তার চলাফেরায় নিষ্পৃহভাব। রাতে তার দেহ জাগে। অদম্য শিহরণ তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। বিয়ের প্রথম প্রথম বড় ভয় লাগত, পরে মধুর আবেশে ভরে গিয়েছিল তার মন আর দেহ। একশ'র অধিক রাতের বিভোরতা সুচিত্রাকে আকুল করে তলে। বালিশ খামচে ধরে সে রাত ফুরায়।^৭

সুচিত্রার মনমরা স্বভাব দেখে মা সুধারানি তাঁর ছোটো ছেলে স্বপনকে তাঁর বৌদির সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু এর ফল হল মারাত্মক। স্বপন দোকানদারি থেকে মন তুলে সুচিত্রার দিকে দিল। আর এর পরেই থেকে সুধাম-সুচিত্রার দাম্পত্য জীবনে অযাচিতভাবে প্রবেশ ঘটল স্বপনের।

বছর দুয়েক পরে সুধাম প্রচুর টাকা নিয়ে কুয়েত থেকে ফেরে। দুই ভাই মিলে পাকা বাড়ি তোলে। ওপাড়ায় তিন কাঠা জমি কেনে। দোকান সাজায়, মাকে শাড়ি আর স্ত্রীকে গয়না দেয়। বাড়ি আসার পর থেকে স্বপন সুধামের ছায়া হয়ে থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে স্বপন। ভাইয়ের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আশ্রিত হয় সুধাম। কিন্তু এসবই যে আসলে অভিনয় তা সুচিত্রার বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই সে আড়ালে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসে। এমনকি সুচিত্রা ও স্বপনের মধ্যে যে শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে তারও টের পেয়েছিলেন সুধারানি। তাই এসম্পর্কে সুধামকে সজাগ করতে চেয়েছিলেন তাঁর মা। কিন্তু সুধাম তাঁর কথায় কান না দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাড়ি ফিরে আসার পরে রাত্রিবেলা সুচিত্রার কাছে গেলে সুধাম বুঝতে পারে বদলে গেছে অনেক কিছু। গল্পকারের ভাষায়—

রাতে সুধাম সুচিত্রায় নৌকা ভাষায়। সুচিত্রা তরঙ্গিত হয়, সুধাম শব্দ হাতে হাল ধরে। জল কেটে সুধামের নৌকা গন্তব্যে পৌঁছে। একরাতে সুধামের হঠাৎ মনে হল—সুচিত্রা যেন সুচিত্রাতে নেই।^৮

দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে যে সংকট এসে উপস্থিত হয়েছে গল্পকারের এই বক্তব্য তার প্রমাণ দেয়। যদিও সুচিত্রা জানায়—

কই নাতো, আনমনা হব কেন? এহিতো তোমার গায়ের সাথে গা লাগিয়ে আছি। তোমার মন শুধু শুধু কু ডাকছে।^৯

গায়ের সাথে গা লাগিয়ে বসে থাকলেও সুচিত্রার মন পড়ে রয়েছে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। আর সেই কথা সুধারানি যতবার সুধামকে বলতে গিয়েছে ততবারই সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে। এমনকি তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক যাতে অটুট থাকে তার জন্য মা সুধারানি বিদেশ যাবার আগে ছোটো ছেলের বিয়ে দিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু স্বপন রাজী না হয়ে বলে— ‘না না দাদা, এখন না। তুমি বিদেশ থেইক্যা ফিইরা আসো। তখন দেখা যাইবো।’^{১০} ভাইয়ের কথায় সুধাম সম্মতি দিলেও সুধারানি জানায়— ‘বিয়াডা করাইয়া গেলে ভালো অইতো সুধাম।’^{১১} সুধারানির কথায় সুচিত্রা ‘কটমট করে’ তাঁর দিকে তাকায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না সুচিত্রার এই তাকানোর মধ্যে দিয়ে গল্পকার আসলে অন্য এক রহস্যের কথা তুলে ধরতে চাইলেন।

গল্প এগিয়ে চলে। সুধামের বিদেশ যাওয়া আসা চলতে থাকে। একবার দেড় বছর পর বাড়ি ফিরে আসে সুধাম। জনার্দন কাকার কাছে জানতে পারে বাড়ির গোপন খবর—

ঘরের খবর রাখনি সুধাম?.. চোখ কান খোলা রাইখো। ঘরের ভিতর নজর দিও। দেখতে পাইবা অনেক কিছু।^{১২}

সত্যি, সেই রাতেই সুধাম দেখেছিল অনেক কিছু। গল্পকারের ভাষায়—

সেই রাতেই সুধাম শরীরের ওপর শরীর দেখল। গভীর রাতে বাহ্যে ধরেছিল তাকে। উঠান পেড়িয়ে পায়খানা। কিন্তু পায়খানার দিকে যেতে যেতে পেটের মোচড় থেমে গেল সুধামের। ফিরে এল সুধাম। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে উঁকি দিতেই সুধামের মাথায় চক্কর। কে যেন চট করে সুচিত্রার বুকের ওপর থেকে নেমে গেল। কে যে দ্রুতবেগে পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে। সুধামের চিনতে ভুল হলো না—এ যে স্বপন! রামের ভাই লক্ষণ!^{১৩}

জনার্দন কাকার গোপন খবর বুঝতে পারে সুধাম। ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের বুনিয়াদ। অনেক আশা, ভরসা নিয়ে সে পাড়ি দিয়েছিল বিদেশে, বুকের রক্ত মুখে তুলে সে উপার্জন করেছিল প্রচুর অর্থ, চেয়েছিল পরিবারকে খুশি করতে কিন্তু স্নেহের ভাই তাঁর জীবনকে যে এভাবে নষ্ট করে দেবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সে চেয়েছিল সুন্দর, সুখী একটি দাম্পত্য জীবন। কিন্তু তাঁর ভাই সেই জীবনকে করে তুলেছিল বিপর্যস্ত।

নিজের চোখে এই ঘটনা দেখে বিপর্যস্ত সুধাম নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। তাই ছেলের ‘বাবা’ ডাকে সুধাম হিংস্র হয়ে ওঠে। ছেলেকে মাথায় তুলে আছাড় মারে। চিৎকার করে বলে ওঠে, ‘জারজ কোথাকার! খানকির পোলা, আমারে ডাকস বাবা!’^{১৪} দাম্পত্য সম্পর্ক এমন তলানিতে এসে ঠেকে যে সুচিত্রা তাঁকে পাগল প্রতিপন্ন করতে চাই। সুধাম তাঁর ধৈর্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বলে ওঠে— ‘বেইশ্যা মাগি, তুই আমার সামনে আইসবি না। স্বপনের লগে লেপ্টালেপ্টি করগে যা।’^{১৫} কিন্তু স্বপন একথা অস্বীকার করলে দা নিয়ে স্বপনের পিছনে ছোটো সুধাম। স্নেহের সম্পর্ক বদলে যায় শত্রুতায়। নষ্ট হয়ে যায় তাঁদের দাম্পত্য জীবন। পাড়ায় রটে যায়, গতরাতে সুধাম হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। সুধারানি বিলাপ করতে করতে বলেন—

তোরে অনেক আগে বইলতে চাইছিলাম রে সুধাম! তুই আমার কথায় কান দিস নাই। এখন আমার কী অইবো রে ভগমান!^{১৬}

আর এই ঘটনার পর থেকে সুধামকে বিভিন্ন রাস্তায়, অলিগলিতে দেখতে পাওয়া যায়। যাকে সামনে পায় তার কাছে বলতে থাকে তাঁর যন্ত্রণার কথা—

ও কাকা, ও কমিশনার সাব, ও মাসিমা, ও মুণাল, আমার বউয়েরে কুন্ডায় ছুঁইছে। লুচাই লুইট্যা লইছে আমার বউয়ের যৌবন, সতীত্ব গেছে তার। আমি বলে পাগলা! হা হা হা...।^{১৭}

দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এইভাবে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ভাইয়ের উপস্থিতি তাঁদের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিল। নষ্ট করেছিল তাঁদের মানবতা।



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

হয়ে উঠেছিল হিংস্র। পাশাপাশি সুচিত্রার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা গোপন লালসার কথাও এখানে প্রকাশিত। স্বামীর একাকীত্বে দিশেহারা সুচিত্রা তার ‘পিপাসার নিবৃত্তি’ মেটাতে বেছে নিয়েছিল স্বপনকে। তাই তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্টের পিছনে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে স্বপনের উপস্থিতি যেমন দায়ী, অনুরূপভাবে সুচিত্রার মনের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা গোপন লালসাও সমানভাবে দায়ী।

দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি— দাম্পত্য সংকটের এই চেনা ছকের বাইরে গিয়েও যে গল্প লেখা যায় তার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল হরিশংকর জলদাসের ‘প্রতীক্ষা’^{১৯} গল্পটি। বিয়ের কিছুদিন পরেই স্বামী সুদর্শনের নারীসন্তোগের অক্ষমতার কথা জানতে পেরে স্ত্রী নমিতার মনে যে তীব্র ঘৃণাবোধ জন্মেছিল তা যেমন প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পে। অনুরূপভাবে নিজের অতৃপ্ত বাসনাকে তৃপ্ত করতে তার যেকোনো চেহারার, যেকোনো বয়সের পুরুষের প্রতি আসক্তিরও প্রকাশ ঘটেছে।

গল্পটি শুরুই হয়েছে বাসররাত্রে নব দাম্পত্যের সংলাপের মধ্যে দিয়ে। যদিও সেই রাতে নমিতার শারীরিক অসুবিধার কারণে তাঁরা রতিক্রিয়া থেকে দূরে থাকে। দেখতে দেখতে দিন চলে যায়। নমিতার মনে কামনার উদ্রেক হয়। তার শরীরে আর মনে উত্তেজনা জাগে। সুদর্শনের জন্য তার শরীর উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। সে ঠিক করে ‘সুদর্শনকে তার আজকে চাই-ই চাই’^{২০} মিলনের জন্য চূড়ান্ত মুহূর্ত তৈরি হয় সেই রাতেই। গল্পকারের ভাষায়—

সেরাতে সুদর্শন ফিরে জানায়— সে বাহির থেকে খেয়ে এসেছে। কোনো ভূমিকা ছাড়া দরজা বন্ধ করে নমিতা। সুদর্শনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুদর্শনও সক্রিয় হয়। তার ঠোঁট, তার হাত নমিতার শরীরের ভাঁজে-বাঁকে ঘুরতে থাকে।^{২১}

চরম মুহূর্ত যখন উপস্থিত নমিতা বুঝতে পারে সুদর্শনের শিশু নির্জীব-নিষ্ক্রিয়। বিপুল আকুলতা নিয়ে নমিতাকে সুদর্শনকে কাছে টেনে নিলে সে হঠাৎ কান্নামাখা কণ্ঠে বলে ওঠে—

নমিতা আমাকে মাফ কর। আমি বড় অন্যায় করে ফেলেছি। তোমাকে বিয়ে করে তোমার জীবনটা আমি তছনছ করে দিয়েছি। আমি অক্ষম। নারীসন্তোগ করার মতো কোনোরকম সক্ষমতা আমার মধ্যে নেই।^{২২}

সুদর্শনের এই কথার কোনও উত্তর দেয় না নমিতা। কারণ স্বামীর পুরুষত্বহীনতার কথা শুনে নমিতার মনে তীব্র ঘৃণাবোধ জন্ম নেয়। নমিতা ভাবে— কী বলবে সে এখন সুদর্শনকে? নিজেই বা কী করবে? নখের আঁচড়ে আঁচড়ে সুদর্শনকে রক্তাক্ত করবে? না চিৎকার করে বলবে— হারামজাদা, নচ্ছার! নপুংসক!...^{২৩}

শরীরের বিশেষ স্থানে থই থই জল। কী করবে সে এই জল নিয়ে, এই স্তন নিয়ে, এই ঠোঁট নিয়ে, এই গ্রীবা নিয়ে, এই কপোল নিয়ে, এই কামময় উষ্ম নিশ্বাস নিয়ে? কাকে নিয়ে ভাববে সে? একার তার কোনো রাত থাকল না, যেরাতে স্বামী-স্ত্রীতে নিবিড়ভাবে মাখামাখি হয়।^{২৪}

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই অনমনস্ক হয়ে যায় নমিতা। স্বামী সন্তোগকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া তার মনের সমস্ত স্বপ্ন, ইচ্ছেগুলোর মৃত্যু ঘটতে থাকে। সুদর্শনের নাক ডাকার শব্দে চেতন ফেরে নমিতার। নমিতা দেখতে পায় সুদর্শনের গোটা শরীর জুড়ে পুরুষত্বহীনতার প্রকাশ। প্রচণ্ড ঘৃণায় নমিতার মনে বহুবিধ চিন্তার উদয় হয়—

নিজের পুরুষত্বহীনতার কথা জেনেও কেন সুদর্শন তাকে বিয়ে করল? যে-পুরুষের স্ত্রী-সংসর্গের যোগ্যতা নেই, সে কেন নারীসঙ্গ চাইল? কাপুরুষ, শিশুহীন কোথাকার! বিয়ে হলো এতদিন, কই কোনোদিন তো তার শরীরটাও দেখতে চাইল না হারামি। যদি চাইত, অন্তত শরীরটা খুলেমেলে দেখিয়ে সন্তুনা পাওয়া যেত।^{২৫}

নারীসন্তোগে ব্যর্থ সুদর্শনের কাছে নমিতার আর কিছুর চাওয়ার নেই। সে বুঝে গেছে তার অক্ষমতার কথা। আর এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নমিতার কাছে দাম্পত্য জীবন বিস্ময় হয়ে উঠেছে। কারণ কাপুরুষ, শিশুহীন স্বামীর সঙ্গে থেকে আর যাইহোক মধুর দাম্পত্য জীবন কাটানো সম্ভব নয়। কিন্তু সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে নমিতার একজন পুরুষ প্রয়োজন। তাই—

হঠাৎ করে বিছানায় ওঠে বসল নমিতা। দরজার দিকে হন হন করে এগিয়ে গেল। এক ঝটকায় দরজাটা হাট করে খুলে দিল। তারপর ধীর পায়ে খাটের পাশে এল। শাড়ী-ব্লাউজ আলগা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে বিছানায়। এখন তার একজন পুরুষ চাই। যে কোনও চেহারার, যে কোনো বয়সের। হোন না তিনি স্বশুন্দের মতো।^{২৬}

এক কঠিন বাস্তবকে গল্পকার এখানে তুলে ধরলেন। সন্তোগসুখ থেকে বঞ্চিত নমিতার কাছে পিতা সমান শত্রুরও বাদ গেলেন না। নিজের অতৃপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করতে শত্রুর সন্তোগসুখকেই নমিতা কামনা করে বসল। নমিতার এই আচরণ আসলে নপুংসক স্বামীর প্রতি তীব্র ঘৃণাকেই প্রকাশ করে। পাশাপাশি তাদের দাম্পত্যজীবনেরও মৃত্যু ঘোষণা হয়। বস্তুত, বাংলা ছোটগল্পে এই ধরনের বিষয় নির্বাচন এবং ঘটনার বর্ণনা সত্যিই অভিনব।

হরিশংকর জলদাসের ‘ভাঙন’^{২৭} গল্পটিতেও নষ্ট দাম্পত্যের ছবি পুরো মাত্রাই বজায় আছে। গল্পটিতে দেখা যায় জমিদার দীপেন চৌধুরীর নাতি কুলদীপ চৌধুরী বগলা নদীর উত্তরপারে ‘টেকের হাট’ নামে একটি হাটের পত্তন করেছিলেন। পরে সেখানে একটি হাট বসিয়েছিলেন। দীর্ঘদিনেই, ধবধবে ফর্সা, চিলের নাকের মতো বাঁকানো নাক, চিকন গোফ, ইংরেজদের মতো জুলফি এবং টাক মাথার অধিকারী কুলদীপ চৌধুরীর সঙ্গে একদিন বিয়ে হয় সুন্দরী অরুন্ধতীর। স্ত্রীর মনোরঞ্জননের জন্য বগলা নদীতে বিশ ধাপের ঘাট তৈরি করালেন, নিজের তৃপ্তির জন্য বজরা বানালেন এবং সেই বজরা দেখাশোনা করার জন্য রামলালকে নিযুক্ত করলেন কুলদীপ।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বজরার কক্ষে প্রবেশ করেন কুলদীপ আর অরুন্ধতী। শোভিত শয্যায় গা এলিয়ে দেন তারা। বজরার দুলুনি বাড়াতে থাকে। কিছু সময় পড়ে কক্ষ থেকে বেড়িয়ে এলে তাদের দুজনকে বড়ো ক্লান্ত দেখায়। কিন্তু এই ক্লান্তিতেও যে তাদের কোনো সুখ নেই তা তারা উপলব্ধি করতে পারে। তারা বিপর্যস্ত, বিরক্ত। কোনোদিন অরুন্ধতী আর কুলদীপের কণ্ঠে বেজে ওঠে সন্তান না হওয়ার কথা। অরুন্ধতী বলে—

আমাদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর পেড়িয়ে যেতে চলল, সন্তান তো এল না কোলে।^{২৮}

কুলদীপ জানায়— ‘বুঝতে পারছি না’^{২৯} কুলদীপের এই উত্তরে বিরক্তি ভাব এনে অরুন্ধতী প্রশ্ন করে—

কার অক্ষমতা কে জানে?... এজন্যে দায়ী আমি না তুমি?^{৩০}

অরুন্ধতীর মনের এই গভীর বেদনা এক সন্তানহীনা মায়ের কাতর আত্মিক যেমন মনে করিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে যে একটা চিড় ধরতে শুরু করেছে তাও বুঝতে পারা যায়। আর এই ফাটল আরও বড়ো করে দেখা দেয় কালীপুজোর দিন প্রদীপের আগুনে অরুন্ধতীর কান সমেত গালের ডান অংশটি পুড়ে যাওয়ার পর থেকে।

এই ঘটনার পরে প্রায় এক বছর কেটে যায়। কুলদীপ এখন আর নদী ভালোবাসেন না। প্রকৃতি তাকে আর আকৃষ্ট করে না। সন্ধ্যে নামলে অরুন্ধতীকে নিয়ে তিনি এখন আর নদীজলে বজরা ভাসান না। তার কাছে অরুন্ধতীর সান্নিধ্য এক অসহ্য। গল্পকারের ভাষায়—

তিনি সৌন্দর্যের পূজারি। অরুন্ধতীর দেহ, যৌবন—সব আছে, কিন্তু অরুন্ধতীতে সৌন্দর্য নেই। কুলদীপ মনে করেন—অগ্নিদেব তার



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সৌন্দর্যের প্রায় সবটাই কেড়ে নিয়েছেন। অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত অরুন্ধতী, মুখমণ্ডলীয় শ্রীহীন অরুন্ধতী এখন কুলদীপ চৌধুরীর কাছে অপ্রয়োজনীয়। এখন তিনি অরুন্ধতীকে অবহেলা দেখান না, কিন্তু এড়িয়ে চলে। তিনি এখন জমিদারিতে মগ্ন, তিনি এখন শকুন্তলাতে নিমগ্ন। শকুন্তলা অরুন্ধতীর সেবাদাসী। শকুন্তলা এখন কুলদীপের সেবা করে। কুলদীপের নদী, জোছনা, কাশবন, সন্দের ঘোর—সবই এখন শকুন্তলাতে আবদ্ধ।^{১০}

গল্পকারের এই বক্তব্য শুনে এটুকু পরিষ্কার যে কুলদীপ আসলে ভালেবেসেছে অরুন্ধতীর রূপকে। মানুষ অরুন্ধতীকে নয়। তাই অগ্নিদগ্ধ অরুন্ধতী আজ কুলদীপের কাছে ব্রাত্য। আর যে মুহূর্তে অরুন্ধতী অগ্নিদগ্ধ হয়েছে সেই মুহূর্তে কুলদীপ তার যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করতে বেছে নিয়েছে সেবাদাসী শকুন্তলাকে। আর এইভাবেই তাদের দাম্পত্য জীবন ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেছে।

শকুন্তলায় নিমগ্ন কুলদীপ চৌধুরীর জীবন স্বাভাবিকভাবে অতিবাহিত হলেও অরুন্ধতী হয়ে পড়ে একাকী। তার চারপাশে সবকিছু আছে, নেই শুধু ভালোবাসা আর সান্নিধ্য। চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে আসার পরে কুলদীপ তার শয্যা সরিয়ে নেন। ফলে অরুন্ধতীর কাছে রাত হয়ে উঠল নিরানন্দময়। বাড়ির সকলে তাকে আগের মতো সম্মান দিলেও কুলদীপের এড়িয়ে চলার কষ্টকে ভুলিয়ে দিতে পারল না। এক সাথে খেতে বসলেও কুলদীপ আগের মতো একবারের জন্যও বলে না— ‘তুমি এত কম খাচ্ছ কেন অরুন্ধতী? আজ মাছের মাথাটা তোমাকেই খেতে হবে কিন্তু!’^{১১} পাশাপাশি বা মুখোমুখি বসে দ্রুত খাওয়া শেষ করে উঠে যায় কুলদীপ। গল্পকারের ভাষায়—

কখনো চোখাচোখি হলে সে চোখে প্রেম খোঁজে অরুন্ধতী, খোঁজে আগ্রহ; কিন্তু কুলদীপের চোখ নিষ্পৃহ, প্রেমহীন।^{১২}

কুলদীপ ভালোবেসেছিল সুন্দর রূপের অধিকারী অরুন্ধতীকে, অগ্নিদগ্ধ অরুন্ধতীকে নয়। প্রেম তার কাছে রূপসর্বস্ব। তাই সেই রূপ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুলদীপের চোখে প্রেম, ভালোবাসা সবকিছু হয়ে পড়েছিল নিষ্প্রাণ, নিষ্পৃহ। আর কুলদীপের এই নিষ্পৃহতার কথা বুঝতে পেরে অরুন্ধতীর মনে কুলদীপের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়—

কুলদীপ তাহলে তাকে ভালোবাসেনি, বেসেছে তার রূপকে। রূপকে বলব কেন, বেসেছে তার ডানগালকে। তার তিলসম্মত বামগাল আছে, সে গালে আছে পূর্বের মতো লোভনীয় মসৃণতা, আছে তার পুরুষ্ট স্তন, আছে গ্রীবা, চোখে আছে কটাক্ষ, আছে অপূর্ব দেহবল্লরী আর আছে কুলদীপেমগ্ন একটা মগ্ন। তা সত্ত্বেও কুলদীপ তাকে পরিহার করে চলে। আজ তার ডানগালের দগ্ধ কপোলের কাছে তার দেহ, তার যৌবন, তার মন—সব কিছু হার মানল!^{১৩}

কুলদীপের এই স্বরূপ অরুন্ধতীর কাছে উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুন্ধতীর মনে প্রশ্ন জাগে। তাই অরুন্ধতী তাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘তুমি কেমন আছ কুলদীপ, আছো তো ভালো?’^{১৪} অরুন্ধতীর এই প্রশ্নে কুলদীপ থতমত খেয়ে যায়। খাবার মুখে না পুরে অরুন্ধতীর দিকে তাকায়। কিন্তু তার চোখ আটকে যায় অরুন্ধতীর পোড়াগালে। ভেতরে চাপা অস্বস্তি নিয়ে কুলদীপের চোখ কঁচুকে যায়। কুলদীপ জানায়— ‘খারাপ থাকার তো কোনো কারণ দেখি না! কোনো কিছুর অভাব হলে মানুষ ভালো থাকে না। আমার তো কোনো কিছুর অভাব নেই!’^{১৫} কুলদীপের এই উত্তরে নির্বাক হয়ে যায় অরুন্ধতী। তার মনে হয়—

হায়রে কুলদীপ! তুমিই তো আমার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে একদিন। আমার ভালোমন্দের তদারকিতে তোমার অধিকাংশ সময় কাটত। আজ কী প্রশ্নের কী উত্তর দিলে তুমি? তোমার যে সব আছে, তা তো বুঝতেই পারছি। আমায় ছেড়ে শকুন্তলাতে উপগত তুমি। আমি সব জানি, সব দেখি। তোমার যেমন দেহ আছে, সেই দেহে ক্ষুধা আছে, তেমনি করে আমারও তো যৌবন আছে, ভেতরে লালসা আছে। শকুন্তলাকে দিয়ে তোমার লালসা মেটাচ্ছ। আমি কাকে দিয়ে মেটাব? ছিঃ ছিঃ আমি একী ভাবছি! ডানে বাঁয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়ে অরুন্ধতী।^{১৬}

যে মুহূর্তে কুলদীপ অরুন্ধতীকে ছেড়ে শকুন্তলাতে নিমগ্ন হয়েছে, নিজের লালসা মেটাতে চেয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই অরুন্ধতীর মনেও তার লালসা মেটানোর ইচ্ছা নিজের অজান্তেই ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ কুলদীপের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া মাত্র সে বেছে নিতে চেয়েছে অপর কাউকে। তাই গল্পের শেষে সে বেছে নিয়েছে রামলালকে। নিজের শরীর দিয়ে প্রলুব্ধ করেছে তাকে। রামলালের নত চোখের দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতী উপলব্ধি করেছে—

কী দেখছ তুমি রামলাল? তোমার চোখের রঙ্গ আমাকে বলে দিচ্ছে, তুমি আমাকে নিয়ে অন্যকিছু ভাবছ। তুমি এই মুহূর্তে মাথা নত করে থাকলেও তোমার ভেতরটা ভাঙছে আমি দেখতে পাচ্ছি। সে ভাঙা কামের, তোমার মুখ, কপাল আর গালের বিন্দু বিন্দু ঘাম প্রমাণ দিচ্ছে। আমার ভেতরটাও কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কাউকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে আমার। আমার ভেতরের প্রজ্জ্বলিত আগুন নেবার জন্যে একটা জলধারা দরকার। রামলাল, আমি দীর্ঘদিনের বুড়ুক্ষু একজন নারী। তুমি আমাকে শীতল সরোবরে অবগাহন করাও রামলাল।^{১৭}

দাম্পত্য সংকটের চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছে অরুন্ধতী শেষ পর্যন্ত তার লালসাকে নিবৃত্তি করতে রামলালকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। একাকীত্ব, অসহায়তা এবং অতৃপ্ত বাসনা তাকে এই কাজে ইন্ধন জুগিয়েছে। চোখের সামনে স্বামীকে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হতে দেখে সেও বেছে নিয়েছে অন্য পুরুষকে। গল্পকারের ভাষায়—

তেল কুচকুচে রামলালের শরীরে যৌবনের গন্ধ। সেই গন্ধে মাতোয়ারা বহুদিনের ক্ষুধার্ত অরুন্ধতী। নিস্তরঙ্গ নদীর বুকে খরস্রোতা জল, সেই জলের ওপর মৃদু কম্পমান বজরা।

বজরার ভেতরে, শয্যাঘরে থই থই জল।^{১৮}

সন্তোগসুখে আচ্ছন্ন নর-নারীর আদিম যৌনতাকে এভাবেই চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরলেন গল্পকার। আর সেইসঙ্গে নষ্ট দাম্পত্যের ছবিও তুলে ধরলেন।

অহেতুক সন্দেহের বশে দাম্পত্য সম্পর্ক অনেক সময় হয়ে ওঠে বিযাক্ত। মানুষ তখন সেই সম্পর্ক থেকে মুক্তি চাই। নিষ্কৃতি চাই ‘সংসার’ নামক কঠিন বন্ধন থেকে। এরমই একটি গল্প হল ‘কীরকমভাবে বেঁচে আছি’^{১৯}। গল্পটি লেখা হয়েছে চিঠির জবানবিত্তে। জীবনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে সংসার সমুদ্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রাক-মুহূর্তে ছেলেকে লেখা বাবার এই চিঠি থেকে উঠে এসেছে তার সংসার জীবনের বহু অজানা কথা।

সংসারে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ছোটোখাটো ঘটনা কীভাবে দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরায় এবং অতিক্রান্ত সময়ের ব্যবধানে সেই ফাটল ক্রমশ বড় আকার ধারণ করতে করতে এক সময় পুরোটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়— তারই প্রমাণ এই গল্প। গল্পে দেখা যায় এম এ পাস করে হাই স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার পর গল্পকথকের সঙ্গে বিয়ে হয় তার অহংকারী স্ত্রীর। অহংকার এবং রাগ তার স্ত্রীকে অন্ধ করে রেখেছিল। ব্যবহার ছিল



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অসংযত। স্বাভাবিক আর সামাজিকতার লক্ষণরেখা সে হেলায় অগ্রাহ্য করত। পরে গল্পকথক আরও বড় একটা চাকরি পেলেন। পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে এলো। কিন্তু গল্পকথকের স্ত্রীর মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। তার চারপাশে বিপুল ঐশ্বর্য্য ফলে তিনি বাজে চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। শুরু হল অহেতুক সন্দেহ। তাই ছেলেকে উদ্দেশ্য করে হতভাগ্য বাবা লিখেছেন—

অফিসের বড় কর্মকর্তা আমি। সকাল থেকে বিকেল, কখনো কখনো সন্ধ্য পর্যন্ত অফিসে সময় দিতে হয় আমাকে। অফিসে সুন্দরী অসুন্দরী নারীরাও নানা পদে চাকরি করে। একটা অফিস তো শুধু পুরুষ দিয়ে চলে না! ওই নারীরাই আমার দাম্পত্যজীবনে বিদ্বের কারণ হল।... অফিসের নারী পুরুষ সবাই আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। আমি কিন্তু তোমার মাকে বিষয়টি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। কেউ যদি আগে থেকেই কোনো একটা বিষয়কে তার বিশ্বাসের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে নেয়, তাহলে তার কাছে সব যুক্তি বা প্রমাণ অগ্রাহ্য হয়।

তোমার মায়ের মনে এই বিশ্বাসটা প্রোথিত হয়ে গেল যে, আমি আগে চরিত্রবান থাকলেও, এখন একেবারে পচে গেছি। অফিসের নারীদের নিয়ে আমি কৃষ্ণলীলায় মগ্ন। অফিস থেকে দেরি করে আসি শুধু ওদের নিয়ে বেলেগ্লাপনায় মগ্ন থাকি বলে। আমি কোনোক্রমেই তাকে বোঝাতে পারিনি—আমি যে-অফিসে চাকরি করি, তা বিশাল এক শপিং কর্পোরেশনের অফিস। আমি সেই অফিসের অধিকর্তা। এই ধরনের অফিসের কোনো টাইমটেবিল নেই। কাজ শেষ না করে বড়কর্তার অফিস ছাড়তে নেই।^{৪০}

কিন্তু গল্পকথকের এই সমস্ত যুক্তি তার স্ত্রীর কাছে ধোঁপে টেকে না। বারেরবারে অপমানে জর্জরিত হতে হয় তাকে। তাই স্ত্রীর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। স্ত্রী বলেন—

চুপ থাকবে না! মাগিখোরের আবার কথা বলার সাহস আছে নাকি? অন্য ঘরে যাবেই তো, যদি ঠোঁটের গালের লিপস্টিকের দাগ আমি দেখে ফেলি।^{৪১}

অহেতুক সন্দেহ এবং অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গল্পকথক সন্ধ্যাবেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু তাতেও নিষ্ফল নেই। দরজা খুলে সিঁড়িতে পা দিতেই পিছন থেকে আওয়াজ আসে—

যাবেই তো। বাইরে তো মেয়ের অভাব নেই। কী জানি অফিসের কোনো মাগি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো।^{৪২}

স্ত্রীর অপমানে মাথা নিচু করে দুচোখে জল নিয়ে বেরিয়ে আসেন রাস্তায়। এভাবেই কাটতে থাকে তাদের অসহ্য, কষ্টকর, অপমানজনক দাম্পত্য জীবন এবং ধীরে ধীরে তারা একসময় তীর সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। প্রতিদিনের নিত্য গ্লানি, যন্ত্রণা আর অপমানকে সঙ্গে নিয়ে তার দিন কাটতে থাকে। তাই চুপ থাকতে না পেরে গল্পকথক একদিন স্ত্রীকে বলেন—

আমাকে নিয়ে তোমার অনেক অশান্তি, তাই না?... তোমার মনের সন্দেহ আমাদের দাম্পত্যজীবনের সুখটা নষ্ট করছে। তুমি এক কাজ কর, একদিন, যখন তোমার ইচ্ছে, আমাকে না জানিয়ে আমার অফিসে চলে এস। তোমার সকল সন্দেহ ঘুচে যাবে।^{৪৩}

কিন্তু এ কথার ফল হল মারাত্মক। গল্পকথকের স্ত্রী বলে উঠলেন আরও অপমানজনক কথা—

আমাকে কচি খুকি পেয়েছ যে, আমি তোমার ওপরচালাকি বুঝব না। কী প্রমাণ করতে চাইছ তুমি একথা বলে? ধোয়া তুলসিপাতা তুমি? ফস্টিনস্টি কর না?... ওই সব বাজারে মাগিদের কোলে বসিয়ে রাখ না তুমি?^{৪৪}

স্ত্রীর অহেতুক সন্দেহে, অপমানে জর্জরিত গল্পকথক সীতার মতো চিৎকার করে বলতে চান, ‘ধরণী বিদীর্ণ হও, আমি পাতালে প্রবেশ করি।’^{৪৫} আর এসব যন্ত্রণা তিনি দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করতে করতে আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। চোখ বন্ধ করে ফ্ল্যাট থেকে বেরোন, চোখ বন্ধ করে ঘরে ফেরেন। তবুও তার স্ত্রীর সন্দেহ পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার সঙ্গে তার খুব খাতির। এইভাবেই তার জীবন চলে যাচ্ছিল। কিন্তু একদিন এই মাত্রাতিরিক্ত সন্দেহ এবং অপমান সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। গল্পকথক গভীর দুঃখে সেই যন্ত্রণার কথা তার ছেলেকে জানিয়েছেন—

একদিন অফিস থেকে ফিরে গায়ের জামাজোড়া ময়লা কাপড়ের বাস্কেটে খুলে রাখলাম। তিনদিন পড়া প্যান্ট-শার্ট ময়লা হয়ে গিয়েছিল। বুয়া জমানো কাপড় সপ্তাহে দু’বার ধুয়ে দেয়। বাথরুম থেকে ফিরে দেখলাম—তোমার মা আমার ছেড়ে-দেওয়া প্যান্টের সামনের দিকের বিশেষ একটি অংশে কী যেন আতিপাতি করে খুঁজছে। আর বারবার নাকের কাছে প্যান্টের ওই অংশটি এনে একটি বিশেষ কিছুর ঘ্রাণ পেতে চাইছে।

অপমানে আমার মাথা বিম্বি বিম্বি করে উঠল। চোখ নিকষ আঁধারে ভরে গেল আমার। আমি নিখর শরীর নিয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম।^{৪৬}

এইভাবেই গল্পকথক স্ত্রীর অপমান, যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে আছেন। তার ব্যক্তিত্ব ধূলিস্মাৎ হয়ে গেছে। জীবন হয়ে গেছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। স্ত্রীর প্রতি তার কোনো প্রেম, শ্রদ্ধা কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তার চারপাশে সবাই থেকেও তিনি হয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণ একাকী। মাঝেমাঝে তিনি চেয়েছিলেন সন্তানের কাছে সবকিছু বলে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে। কিন্তু তার সন্তান সেদিকে কোনো আমল না দেওয়ায় তার মনোকষ্ট আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরুপায় হয়ে ছেলের কাছে গিয়ে এই অপমানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলে ছেলের কাছে তাকে শুনতে হয়েছে—

শেষ রাতে ঘুমিয়েছি বাবা, একটু ঘুমাতে দাও। তোমাদের ব্যাপার তোমরা মিটাও।^{৪৭}

অসহায় বাবা ছেলের শয্যার পাশে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকার পরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে মানি ব্যাগটি সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিলেন বাড়ি থেকে। চলে গিয়েছিলেন তার জন্মগাঁয়ে। হঠাৎ তাকে দেখে ভাইদের চোখে জেগে উঠেছিল প্রশ্ন— ‘দাদা, তুমি! কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো?’^{৪৮} তিনদিন কাটানোর পরে বেরিয়ে পড়েছিলেন সেখান থেকে। উপলব্ধি করেছিলেন সংসারের আসল অর্থ—

প্রাচীনকালে মানুষেরা বানপ্রস্থে যেত। গার্হস্থ্যজীবনে যখন পূর্ণতা আসত, পুত্রেরা সংসারের হাল ধরার মতো যোগ্যতা অর্জন করত, তখন প্রবীণরা ভাবত— আমাদের দিন শেষ। এবার বানপ্রস্থে যাওয়ার পালা। তখন তারা ক্রোধ মোহ ভুলে এক কাপড়ে বেড়িয়ে পড়ত। পেছনে ফিরে তাকাত না। আমারও অকালে বানপ্রস্থে যাবার সময় এসে গেল।

কিন্তু আমার যে এখনও কামনা পূরণ হয়নি, পুত্র সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমার কি সংসার ত্যাগ করা উচিত? এই সময় তোমার মায়ের কথা মনে পড়ল। তোমার মায়ের না হয় মান-অপমানবোধ নেই, আমার তো আছে। আমার সমাজ আছে, সমাজে মান্যতা আছে। গৃহকোণের নিত্যদিনের অপমান একদিন রাজপথে চলে আসবে। তখন মুখ লুকাবার জায়গা খুঁজে পাব না আমি। তারচেয়ে এই-ই ভালো। বানপ্রস্থ। সংসার ত্যাগ। বহুদিন তো সংসারে থাকলাম, এবার না হয় সারের সন্মানে বেড়িয়ে পড়ি।^{৪৯}

রেলস্টেশনে বসে গল্পকথক তার ছেলেকে কীরকমভাবে তিনি বেঁচে আছেন সেই সমস্ত ঘটনাকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে গেছেন। সামনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু গন্তব্য কোথায় তা তিনি জানেন না। জানার আগ্রহও তার নেই। কারণ তার তো গন্তব্যই নেই।



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

গল্পকথকের স্ত্রীর মনের অহেতুক সন্দেহ তাদের দাম্পত্যজীবনের সুখ, শান্তি সবটাই নষ্ট করেছিল। আর স্ত্রীর এই অহেতুক সন্দেহ, মিথ্যা অপমান, নিত্যদিনের জ্বালা, যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে ঘর ছাড়তে হয়েছিল তাকে। একাকীত্ব, অসহায়তা গ্রাস করেছিল তাকে। তার চারপাশে অনেকে থাকলেও এই অপমান, দুঃখ, কষ্টের বোঝা হালকা করার মতো কাউকে কাছে পাননি তিনি। এমনকি তাঁর আত্মজও তাকে সময় দেয়নি। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের একেবারে শেষ মুহুর্তে এসে তিনি সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিত্যদিনের অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন তিনি।

দাম্পত্য সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখা ছোটগল্পকার হরিশংকর জলদাসের গল্পগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করার পর একটি বিষয় পরিষ্কার যে, দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার পিছনে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি যেমন দায়ী, অনুরূপভাবে বিবাহিত দম্পতিরও সমানভাবে দায়ী। কারণ তৃতীয় পক্ষ তখনই স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করছে যখন তাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল দেখা দিচ্ছে, কিংবা একাকীত্ব বা অসহায়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আবার কখনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি ছাড়াই দাম্পত্য জীবনে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। আর তা তৈরি হয়েছে আদিম যৌনতাকে কেন্দ্র করে। কখনো আবার স্ত্রীর অহেতুক সন্দেহের বশে স্বামীকে প্রতিনিয়ত অপমান, গ্লানি ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। দীর্ঘদিনের এই অপমান সহ্য করতে না পেরে নিরুপায় স্বামী একসময় সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান সময় ও সমকালকে মাথায় রেখে দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার পিছনে যে শুধুমাত্র একটি নয়, একাধিক কারণ দায়ী সেই বিষয়টিকেও ছোটগল্পকার হরিশংকর জলদাস তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

চার.
ব্রাত্যসমাজ থেকে উঠে আসা বিশিষ্ট ছোটগল্পকার হরিশংকর জলদাসের গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে ব্রাত্য সমাজের ছবি। তাঁর এই ধরনের গল্পগুলির মধ্যে যেমন সামাজিক অপমানের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনুরূপভাবে সমাজের বিবর্ণ, অবহেলিত, রক্তক্ষরিত, বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত-বিপন্ন মানুষের হাহাকার-আতনাদের ছবিও ফুটে উঠেছে। আর এই বিষয়গুলিকে খুঁজে নেওয়ার জন্যই হরিশংকর জলদাসের বেশ কিছু ছোটগল্প নিয়ে আমাদের এই প্রস্তাবনা।

প্রথমেই ‘কোটনা’^{১০} গল্পটির নাম করা যায়। গল্পটিতে দেখানো হয়েছে ব্রাত্য সমাজের (মুচি, জেলে, মেথর ইত্যাদি) সন্তানদের শিক্ষালাভের পথে যে কত বাধা বিপত্তি থাকে তার সাক্ষাৎ চিত্র। পাশাপাশি তাদের সমাজের আদিম যৌনতা, সমাজের খারাপ পথে পরিচালিত হওয়া এই বিষয়গুলিও ফুটে উঠেছে।

গল্পে আমরা দেখতে পাই হালিমুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ভবতোষ চৌধুরী মুচির ছেলে অশোককে কিছুতেই স্কুলে ভর্তি করতে রাজি হননি। তার ধারণা ‘মুচির ছেলে পড়বে! জুতো সেলাই করবে কে?’^{১১} তাই আইনের দোহাই দিয়ে ছোট বাচ্চা বলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও ধর্মশিক্ষক মৌলভী আবদুল হাফিজের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তাকে ভর্তি নেওয়া হয়। ভর্তির দিনেই চক্রবর্তী মশাই বলেছিলেন—

ক্লাসের একেবারে শেষ বেঞ্চে বসবি তুই, খবরদার সামনে বসার চেপ্টা করবি না কখনো।^{১২}

ব্রাত্য সমাজের মানুষেরা এইভাবেই দিনের পর দিন উচ্চবর্ণের দ্বারা শোষিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে এসেছিলেন। এমনকি স্বয়ং গল্পকারও সেই সামাজিক অপমানের জ্বালা সহ্য করেছিলেন। আর সেকারণেই অতিক্রান্ত সময়ের ব্যবধানে দলিত সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে মধ্য বয়সে তিনি কলম ধরেছিলেন। তাই গল্পে অশোকের প্রতি চক্রবর্তী মশাইয়ের এরূপ আচরণ আসলে গল্পকারের যাপিত জীবনে ঘটে যাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতারই এক প্রতিফলন বলা যায়।

গল্পে দেখা যায়, অশোক ভর্তি হওয়ার এক মাস পরেই জেলের ছেলে ক্ষীরমোহন এসে ভর্তি হয়। গাঁ দিয়ে মেছো গন্ধ বেরোনোর পরেও ক্ষীরমোহনই হয়ে ওঠে অশোকের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। দেখতে দেখতে ক্লাস ফাইভের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বের হয়। ক্ষীরমোহন অশোকের থেকেও ভালো রেজাল্ট করে। টানাটানির সংসার অশোকদের। তাই বোনকে স্কুলে পাঠানো হয়নি। একদিন অশোকের মায়ের চাপাচাপিতে তার বাবা বলেই ফেলে—

দুলালীকে পড়ানোর দরকার কী? আইএ, বিএ পাস করেও তো মুচির ঘরে গিয়ে চুলো ঠেলবো। মুচির ঘরে শিক্ষিত ছেলে কই? আমার মতো জুতা-সিলাইন্যা মুচির সংসারে গিয়া দিনরাত হান্ডি-বাসন মাজতে অইবো। দরকার নাই দুলালীকে পড়ানোর।^{১৩}

মুচি সমাজে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে এই কারণেই নজর দেওয়া হত না। তাই শেষ পর্যন্ত বাঁশবেড়িয়ার এক অশিক্ষিত মুচি-যুবকের সঙ্গে দুলালীকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

এইভাবেই নানারকম সমস্যার মধ্যে দিন কাটতে থাকে অশোকের। ক্ষীরমোহন জানায় তার আর পড়াশোনা করা হবে না। কারণ বাবাকে মাছ ধরার কাজে সহায়তা করতে হবে তাকে। এদিকে ক্ষীরমোহনের বাবা শ্যামচাঁদ কঠোর পরিশ্রম করলেও ভাই গৌরচাঁদ শুয়ে বসে থাকে। ফলে শ্যামচাঁদের মন অশান্তিতে ভরে ওঠে।

যাইহোক জানুয়ারি মাসে অশোক ভর্তি হল হাইস্কুলে। স্কুল শুরু হলে আগের মতো অশোককে আর পিছনের বেঞ্চিতে বসতে হল না। সকলের সঙ্গে মিশে আনন্দময় হাইস্কুল জীবন শুরু হল। তবে অশোক পরে বুঝতে পেরেছিল—

বর্ণবাদী পরিবারের ছেলেরা আমাকে ঘৃণা করত, মুচির ছেলে বলে সত্যি ঘৃণা করত। আনন্দের আতিশয্যে প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। পরে টের পেয়েছিলাম—ওরা আমার সঙ্গে ঠোঁট বেকিয়ে নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলে। সহজে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না।^{১৪}

ব্রাত্য সমাজের প্রতি উচ্চবর্ণের বিদ্বেষ, ঘৃণা যে কতটা তীব্র ছিল অশোকের এই উপলব্ধিতেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। অশোক বুঝতে পারে তাদের জগৎ আর ওদের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। মনটা যখন পুরোপুরি বিধিয়ে উঠেছে অশোকের তখনই একদিন ক্ষীরমোহন এসে হাজির হয়। ক্লাস শুরুর তিন মাস পরে ক্ষীরমোহনের বাবা শ্যামচাঁদ তাকে হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। অশোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আনন্দের সঙ্গে তাদের দিনগুলি কাটতে থাকে। অশোকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। ক্ষীরমোহনের আরও খারাপ। ক্ষীরমোহন রোজ পান্তাভাত খেয়ে স্কুলে আসে। আর সঙ্গে থাকে বাসি তরকারি, কখনো পোড়া মরিচ। কখনো আবার তাও জোটে না।

ক্লাস এইটের বার্ষিক পরীক্ষায় ক্ষীরমোহন থার্ড হয়। শিক্ষকরাও খুশি হয়। ক্লাস নাইনের নাম রেজিস্ট্রেশনের দিন অশোকের বাবা রামদুলাল ছেলের পদবি বদলের প্রস্তাব নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে উপস্থিত হন। তিনি ছেলের পদবি চৌধুরী রাখতে চান—অশোক চৌধুরী। রামদুলালের এই প্রস্তাব শুনে প্রধান শিক্ষক হিমাদ্রী মজুমদার ব্যঙ্গ করে বলেন—



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ধৃতরাষ্ট্রের নাম পদ্মলোচন! কেন বাপু, এত জাতে উঠার বাসনা কেন? ^{৬৬}

কিন্তু অশোকের বাবা সেই ব্যঙ্গকে গায়ে না মেখে নির্ভীক কণ্ঠে জানান তাঁর প্রয়োজনীয়তার কথা—

মুচি বলে হাটে-মহল্লায় মানুষের লাথি চড় খেতে হয়। আমি অশিক্ষিত মানুষ ছার প্রতিবাদ করিনা, করতে পারি না। ভাবি—অশিক্ষিত মুচির ভাইগ্য এর চাইতে আর ভাল কতটুকু হবে কিল খেয়ে হজম করি।... মুচির ছেলে শিক্ষিত হইয়া চাকরি করবে। জীবনে অনেক ঠেকা আছে অশোকের। পদবির জইন্য বারবার লাঞ্চিত হতে হবে তাকে। অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে হইলে অশোকের পদবি বদলান দরকার। অশোকের পরে চৌধুরী লিখলে আমার খুশি লাগবে। ^{৬৭}

জাতে ওঠার জন্য অনেকেই সেই সময় পদবী বদলেছিলেন। কিন্তু অশোকের বাবার এই কথা শুনে প্রধান শিক্ষক মশাই রেগে গেলেন। মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত বেরোল না। শেষ পর্যন্ত মোস্তাফিজুর রহমানের কথায় প্রধান শিক্ষক সম্মত হন। চৌধুরী পদবি নিয়েই অশোকের নাম নথিভুক্ত হয়। ক্ষীরমোহন কিন্তু পদবি বদলায়নি। ক্লাসের প্রধান শিক্ষক এই নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেন—

তোর বন্ধু তো এখন থেকে চৌধুরী—অশোক চৌধুরী। তোরা দু'জন তো হরিহর আত্মা। তোর ইচ্ছে করে না চৌধুরী, সেন, চক্রবর্তী হতে? ^{৬৮} ক্ষীরমোহন উত্তরে জানায়—

না স্যার, ইচ্ছে করে না। আমার বাপ-দাদা মাছ ধরে জলে-সমুদ্রে, তারা জলদাস। তাদের সঙ্গে বেইমানি করব কেন?... বংশের সঙ্গে বেইমানি করব না স্যার। বাবা জলদাস ছেলে চৌধুরী-সেন-চক্রবর্তী হয় কী করে? ^{৬৯}

ক্ষীরমোহনের এই কথায় চুপ হয়ে যান প্রধান শিক্ষক। পড়াতে শুরু করেন। অশোকও সেদিন স্যারের পড়ায় মন বসাতে পারেনি। ক্ষীরমোহনের এই বক্তব্য আসলে স্বয়ং লেখকেরও বক্তব্য। কারণ ‘জলদাস’ পদবি হওয়ার জন্য গল্পকারকেও অনেক অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু সবকিছু সহ্য করেও তিনি পদবি বদলায়নি। এপ্রসঙ্গে হরিশংকর জলদাসের একটি বক্তব্য স্মরণীয়। একদিন এক আসরে গোবিন্দ দাশ ও হারাধন দে নামে দুজন ব্যক্তি তচ্ছল্যমিশ্রিত করুণার সুরে গল্পকার হরিশংকর জলদাসকে পদবি বদলানোর পরামর্শ দিলে তিনি বলেছিলেন—

আমি পরবর্তী জন্মেও জেলের ঘরে জন্মাতে চাই। যে অর্ধশিক্ষিত জেলে-দম্পতি নিজের ঘরের টিন বিক্রি করে ছেলের পরীক্ষার ফি দেয়, যে অশিক্ষিত দাদিমা ঝড়জলের গভীর রাতে নাটিকে হারিকেনের আলোয় কর্দমাক্ত পথ দেখাতে দেখাতে প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি থেকে কালোমাটির জেলেপল্লীতে আসে, যে জেলেপল্লীতে সহোদররা অর্ধপথে নিজেদের পড়া থামিয়ে দিয়ে দাদার পড়ার সুযোগ করে দেয়, সেই সমাজে আমি বারবার জন্মাতে চাই। ‘জলদাস’ পদবির তিলকটি মাথায় ধারণ করে ধন্য হতে চাই। ^{৭০}

পরিবারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নয়, তাঁকে আপন করে নেওয়া এটাই প্রকৃত মানুষের পরিচয় হওয়া উচিত। ক্ষীরমোহন ও গল্পকারের বক্তব্যে সেকথারই সমর্থন পাওয়া যায়। যদিও আর্থ-সামাজিক কারণে এই ধারণা আজ পরিবর্তিত হয়েছে। গল্পকারের ভাষায়—

জেলেরা আজ তাদের পদবি বদলে ফেলেছে। ‘জলদাস’ পদবি ত্যাগ করে চট্রগ্রামের অধিকাংশ অধিকাংশ জেলে তাদের নামের শেষে ‘দাশ’ লিখতে শুরু করেছে। শিক্ষিত জেলেরা স্কুলে ভর্তি করানোর সময় তাদের সন্তানদের নামের শেষে ‘রায়’, ‘সেন’, ‘দাশগুপ্ত’, ‘চৌধুরী’ প্রভৃতি পদবি যুক্ত করে দিচ্ছে। সামাজিক নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে, হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তারা এই লুকোচুরির আশ্রয় নিচ্ছে।...

...জেলেসন্তান হিসেবে পরিচয় পেলে স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও সহপাঠীরা নানাভাবে বিপন্ন-বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে, তার মধ্যে মানসিক নির্যাতন প্রধান। জেলেরা আজ ‘ডোম’ নামে অভিহিত হচ্ছে। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের কোণঠাসা করে রাখার প্রবণতা আজও বর্ণবাদী সমাজে সর্গর্বে বিরাজমান। এসকল বিপর্যয়-বিষন্নতা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে জেলেরা আজ পদবির ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু কোনোভাবে এই মেকি-পুচ্ছ ধারণের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়লে তারা নানা রকম মর্মঘাতী উপহাসের সম্মুখীন হচ্ছে। ^{৭১}

গল্পকারের এই স্মৃতিচারণ আসলে সমাজে জেলেদের অসহায় অবস্থার কথাকেই মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য এজন্য তারা কোনোভাবেই দায়ী নয়। দায়ী তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সংস্কার। একারণে তারা পদবি বদলাতে বাধ্য হচ্ছে। আর ‘এই পদবী বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জিত হচ্ছে তাদের আত্মবোধ, নিজস্ব সংস্কার-সংস্কৃতি’ ^{৭২}। কিন্তু ‘দলিত সমাজের প্রতিনিধি’ হরিশংকর জলদাস তাঁর নিজস্ব-সংস্কৃতি, আত্মসম্মানবোধকে বিসর্জন দেননি। ‘জলদাস’ পদবি নিয়েই এগিয়ে গেছেন এবং পরবর্তীতে তাদের জন্য কলম ধরেছেন। তাই গল্পে ক্ষীরমোহনের অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে গল্পকার আসলে তাঁর প্রতিবাদের ভাষাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

গল্প এগিয়ে চলে। পরবর্তীতে দেখা যায় এই ঘটনার পর থেকে ক্ষীরমোহন আর স্কুলে আসেনি। বাড়ি থেকেও চলে গেছে সে। ক্ষীরমোহনকে ছাড়াই অশোক স্কুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অশোক ধীরে ধীরে এসএসসি, আই এ ও বিএ পাস করে। একসময় তার বাবা মারা যায়। তারপর নরসিংদীর বেলাব হাইস্কুলে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে অশোক। বছর পাঁচেক পরে অমল দত্তের মেয়ের সঙ্গে চৌধুরী নাম থাকার কারণে অতি সহজেই বিয়ে হয়ে যায়।

মায়ের মৃত্যুর পরে চার-পাঁচ দিনের জন্য নিজের গ্রামে আসে অশোক। সেখানে দেখা হয় ক্ষীরমোহনের সঙ্গে। ক্ষীরমোহনের কাছে নিরুদ্দেশের কারণ জানতে চাইলে সে জানায়—

আমি ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম সেদিন। তারপর মানুষকে জিজ্ঞেস করে করে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে। হ্যাঁ, বেশ্যা পাড়ায় গিয়ে বেশ্যার দালালি করেছি আমি এতদিন। ^{৭৩}

বিস্মিত অশোক এর কারণ জানতে চাইলে ক্ষীরমোহন বলে—

বেশ্যার পোলার কোটনা হওয়াই তো স্বাভাবিক।... তোমার মনে আছে কিনা জানি না, যেদিন হেডস্যার তোমার পদবি নিয়ে রংগতামাশা করলেন, সেদিন একটু আগেভাগেই স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে তুমি চলে গেলে তোমার বাড়ির দিকে। আমি পা বাড়লাম আমার ঘরের দিকে। এই সময় বাবা সমুদ্রে থাকবে জানতাম। মা তো ঘরে আছে। এদিক ওদিক তাকালাম। মাকে দেখলাম না। ঘরের বাঁশের দরজাটা আধো খোলা। আমি আনমনে ঘরে ঢুকে গোলাম।...তাকিয়ে দেখলাম—ঘরের ভেতর মা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাকা তার বুকের উপর। ^{৭৪}

ব্রাত্য সমাজের এই কঠিন বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারেননি গল্পকার। তাই গল্পের শেষে এই আদিম যৌনতার দৃশ্যকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে গল্পকার আসলে জেলে সম্প্রদায়ের জীবনের নির্মম সত্যকে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি গল্পটির মধ্যে দিয়ে ব্রাত্য সমাজের প্রতি উচ্চবর্ণের অবহেলা, ঘৃণা ও



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

লাঞ্জনার ছবিও ফুটে উঠেছে। সেইসঙ্গে তাদের বহিরঙ্গের আবরণকে উন্মোচন করে তাদের ভিতরের আসল সম্পর্ককে খুঁজে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের সমকালীন সমাজচিত্রও উঠে এসেছে।

‘দইজ্যা বুইজ্যা’^{৯৪} গল্পেও দেখা ব্রাত্য সমাজের মানুষদের ওপর পাকিস্তানি খান সেনাদের নিপীড়নের সাক্ষাৎ চিত্র। গল্পে দেখা যায় পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন মোর্শেদের দ্বারা জগমোহন জলদাসের ষোলো বছরের মেয়ে পারুলবালা ধর্ষিতা হয়। শুধু তাই নয় পতেংগার এই জেলে পাড়াটি পাকিস্তানি খান সেনা ও রাজাকারদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত, লাঞ্চিত ও অত্যাচারিত হয়। পাড়া বেড় দিয়ে যুবক ও মধ্যবয়সীদের একত্র করে তাদের দিয়ে বড় বড় গাছ ও বাঁশ কাটায়। রাজাকাররা মোটা বেতের বাড়ি মারে, রাইফেলের গুলো দেয় জেলেদের পিঠে-পাছায়। তাদের দিয়ে কাটা গাছ-বাঁশ বয়ে নিয়ে যায় নিজেদের আস্তানায়। ওগুলো দিয়ে নিজেদের বাংকার সুরক্ষিত করে। এইভাবে নির্মম অত্যাচার করেই তারা ক্ষান্ত হন না। গল্পকার জানিয়েছেন যে ফিরে যাওয়ার সময় পাকিস্তানিসৈন্য ও রাজাকাররা—

মধুসূদনের ছাগলটা, মালতীর হাঁস চারটি, বুড়া হারানের বাপের প্রসবোন্মুখ গরুটি নিয়ে যায়। জেলেদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। শুধু মনে আগুন জ্বলে, রাগে-ক্ষোভে শরীর কাঁপে। সেই কাঁপুনি অতি কষ্টে জীর্ণ কাপড়ের তলায় ঢেকে রাখা তারা।^{৯৫}

অবশ্য তাদের মধ্যে একজন প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। তাই ক্যাপ্টেন মোর্শেদের ‘তোম লোগ হিন্দু হো?’^{৯৬} এই প্রশ্নের উত্তরে দইজ্যা বুইজ্যা বলে ওঠে—

না না ছার, হামারা লোক হিন্দু না। জাইল্যা ছার, জাইল্যা আমোরা।^{৯৭}

এই দইজ্যা বুইজ্যাই শেষ পর্যন্ত খান সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তাই ক্যাপ্টেন মোর্শেদ খান সেনা ও রাজাকারদের নিয়ে পারুলবালাকে দ্বিতীয়বারের জন্য ধর্ষণের উদ্দেশ্যে তাদের বাড়ি পৌঁছালে গোপনে দা হাতে নিয়ে লুকিয়ে থাকে দইজ্যা বুইজ্যা। পারুলবালাকে না পেয়ে তার মা তোতারানির ওপর ক্যাপ্টেন ঝাঁপিয়ে পড়লে ধারালো দা নিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে সে। গল্পকারের ভাষায়—

মোর্শেদের গলা বরাবর কোপ মারে দইজ্যা বুইজ্যা। মাথা বাঁচাতে মোর্শেদ ডান হাত ওপরে তুললে কোপটা সেই হাতেই পড়ে। বিচ্ছিন্ন হাতটা মাটিতে পড়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। তবু দইজ্যা বুইজ্যা থামে না। কোপাতে থাকে। একটা কোপ পাকিস্তানি হায়েনাটার মাথা বরাবর পড়ে। মাথা দু’ফাঁক হবার আগে মোর্শেদ মরণ চিৎকার দেয়।

ক্যাপ্টেনের আত্মচিৎকারে বাইরে দাঁড়ানো সেনাদের মধ্যে ঘূর্ণি ওঠে। তড়িৎবেগে ঘরে ঢোকে তারা। একজন সেনার রাইফেলের গুলি দইজ্যা বুইজ্যার মাথা এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে পতেংগার জেলেপাড়াটি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অজস্র গুলির আওয়াজ রাতের নিস্তর্রতাকে ছত্রাকন করতে থাকে।^{৯৮}

এইভাবে জেলেপাড়ার অসহায় মানুষদের ওপর নির্মম অত্যাচার, নিপীড়ন চালায় পাকিস্তানি খান সেনারা। অর্থাৎ বাংলাদেশের ব্রাত্য সমাজের অবস্থা যে চিরকাল একই রকম ছিল গল্পকারের অনুসন্ধানী দৃষ্টি সেকথায় মনে করিয়ে দেয়।

‘দুলারি এবং কয়েকজন’^{৯৯} গল্পেও দেখা যায় ব্রাত্য সমাজের এক নারীর অসহায়তার ছবি। গল্পে দেখা যায় শ্যামল দত্ত নামে এক উচ্চবর্গীয় মানুষ নিম্নবর্গের দুলারিকে বিয়ে করে। দেড় বছর পরে দুলারি জানতে পারে তাঁর স্বামী বিবাহিত এবং তাঁর দুটো সন্তান আছে। দুলারি স্বামীর কাছে এরূপ আচরণের কারণ জানতে চাইলে শ্যামল ঔদ্ধত্যের সুরে জানায় তাঁর জাত্যাভিমানের কথা—

গার্মেন্টসে চাকরি কর। তোমাকে এই শ্যামল দত্ত বিয়ে করেছে এই তোমার সৌভাগ্য।... জাইল্যার মাইয়ারে বিয়ে কইরা এই শ্যামল দত্ত তো তোমাকে জাতে তুলেছে।^{১০০}

ক্ষোভে, দুঃখে অসহায় দুলারি শ্যামলের জাত দূলে বিদ্রূপ করে। তাকে চড় মেরে তাড়িয়ে দেয়। হয়ে পড়ে একাকী, অসহায়। দুই সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু সমাজের কাছে আবার সে লাঞ্চিত হয়। বহুদরহাটের বস্তিতে আশ্রয় নেওয়ার প্রথম রাতেই সে ধর্ষিতা হয়। সন্তানদের নিয়ে আবারও বিভিন্ন জায়গায় ভেসে চলতে চলতে একসময় এক অধ্যাপকের বাড়ির গেটের সামনে আশ্রয় নেয়। সেখানেও তাকে পাড়ার মস্তান জগলু দ্বারা ধর্ষিত হতে হয়। একদিন অধ্যাপক দুলারিকে চিৎকার করতে নিষেধ করলে তাঁর সমস্ত রাগ অধ্যাপকের ওপর এসে পড়ে। আসলে শ্যামলের অপমান, লাঞ্ছনা তাকে সমাজের সমস্ত উচ্চবর্গের প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয়। তাই কদর্য ভঙ্গিতে অধ্যাপককে উদ্দেশ্য করে বলে—

ওই বেড়া, আমি চিৎকার করছি তোর কী? আমি একশবার চিৎকার করব, হাজারবার চিৎকার—তাতে তোর কিরে বেড়া? খানকির পোলারা আমার শরীর ঘাঁটছে, আমার লগে ফুতছে। টাকা না দিয়া চইল্যা গেছে চোদানির পোলারা। টাকা না পাইলে খামু কি, মাইয়া দুইডাআরে খাওয়ামু কি? তুই দিবি নারে বেড়া টাকা? তুই খাইয়া যা, টাকা দিয়া তুইও শরীর চাইট্যা যা।^{১০১}

লজ্জায় অধ্যাপকের মুখ নত হয়ে যায়। অধ্যাপকের ভাই দাদার এই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দুলারিকে চড় মেরে শিক্ষা দেয়। অনেক চিৎকার চৈচামেচির পর সকলে মিলে দুলারিকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

কিন্তু এর ফল হল হল মারাত্মক। সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই পাড়ার মস্তান জগলু এসে জানিয়ে যায় দুলারি এখানেই থাকবে। সেই থেকে দুলারি এখানেই থাকে এবং অধ্যাপকের নামে গালিগালাজ। উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে এক সময় বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। যাওয়ার আগে দুলারি বলে—

কার লগে লাগতে আইছিলি হারামির পোলা? লাগতে আসার আগে চিন্তা করস নাই—মাগির পাওয়ার কত? ^{১০২}

উচ্চবর্গীয় সমাজ তাকে এরূপ আচরণ করতে বাধ্য করিয়েছে। যে চেয়েছিল একটি সুখী দাম্পত্য জীবন। কিন্তু শ্যামল তা হতে দেয়নি। তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ভোগ করেছে তাঁর শরীর, অর্থ সবকিছু। সন্তানদের নিয়ে দিশেহারা দুলারি তাই শেষপর্যন্ত এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। সেকারণে তাঁর রাগ সমস্ত উচ্চবর্গের প্রতি। তাই অধ্যাপকও তাঁর অপমানের হাত থেকে বাদ যাননি। এইভাবেই গল্পকার উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের শোষণ, নিপীড়ন ও অবহেলা এবং বিপন্ন-বিধ্বস্ত মানুষদের হাহাকারকে ভাষা দিয়েছেন।

‘কুস্তীর বস্ত্রহরণ’^{১০৩} গল্পেও স্বাধীনতার জন্য নিম্নবর্গের নারীদের ওপর অত্যাচারের ছবি ফুটে উঠেছে। গল্পে দেখা যায় মালো পরিবারের পুত্রবধূ কুস্তী একসময়ের রাজাকার ও বর্তমানের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ও তাঁর দলবলের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিল। কারণ আবুল কাশেমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল কুস্তী। আবুল কাশেমের ইচ্ছা ছিল মালোপাড়ার বহু পুরোনো শ্মশানঘাটটিতে একটি বাগান বাড়ি বানানোর। পরিবর্তে মালোদের জন্য তিনি একটি বাঁধানো শ্মশান ঘাট বানিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে বাধ সাধে কুস্তী। হঠাৎ ভিড় ঠেলে সামনে এসে বলে—

এ কী কইতাছেন চেয়ারম্যান সাব। পুস্তপুরুষের শ্মশান আমাদের! আমাদের বাপ-দাদা, তাদের মা-বাপ, কত শত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই শ্মশানের সঙ্গে! আপনি কী করে বলেন ওই শ্মশান ছেড়ে দিতে! ^{১০৪}

কুস্তীর এই প্রতিবাদ শুনে খতমত খেয়ে যায় আবুল কাশেম। ফখরে আলমের কাছ থেকে জানতে পারে কুস্তীর পরিচয়—



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ভীষ্মের বউ কুন্তী হজুর। মালোপাড়ার জয়নাব হজুর।... এই পাড়ার মালোরা কুন্তীকে বড় মানে হজুর।^{৭৬}
আবুল কাশেম কুন্তীর ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হয়। তিনি নানাভাবে বোঝাতে থাকেন শ্মশানটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কুন্তী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকে। সে অকপটে জানিয়ে দেয়—

দরকার নাই আমাদের বাঁধানো শ্মশানের। পূর্বপুরুষের শ্মশান আমাদের মাথায় থাক। এই শ্মশানের দিকে নজর দিবেন না চেয়ারম্যান সাহেব।^{৭৭}
মালোপাড়ার প্রায় সকলেই কুন্তীর কথায় সম্মতি দেয়। কিন্তু আবুল কাশেম শ্মশান ঘাটে মরা পোড়ানোর নিষেধাজ্ঞার কথা হুমকির সুরে জানিয়ে যায়।

এর কিছুদিন পরেই ইলেকশন আসে। অজয় মণ্ডলের বাড়ির উঠোনে মিটিং বসে। সকল মালোকে একত্রিত করে তাদের উদ্দেশ্যে আবুল কাশেম তাদের পার্টিকে ভোট দেবার কথা ঘোষণা করে। সকলে চুপ থাকলেও কুন্তী এর প্রতিবাদ করে—

আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজী না। কাকে ভোট দেব তা আমরাই ঠিক কইরবো। কাকে ভোট দেব, তা নির্ধারণ করার আপনি কে? ^{৭৮}
কুন্তীর এই প্রতিবাদে আবুল কাশেমের দলের লোক শহীদুল চিংকার করে ওঠে। হুমকির সুরে বলে— ‘তেরিমেরি করস ক্যান? তেল অইছে গায়ে। তেল চেষ্টে নেব শরীর থেকে।’^{৭৯} কিন্তু আবুল কাশেম বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে সকলে ভোট দেওয়ার কথা পুনরায় মনে করিয়ে দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নেয়। চলতে থাকে কুন্তীর ‘দেমােক ভাঙার ব্যবস্থা’।

সেদিন রাতেই মারা যান অজয় মণ্ডল। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে দাহকার্যের জন্য কুন্তীসহ মালোপাড়ার আরও অনেকে শ্মশান ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। মালোরা যখন প্রস্তুতি কার্য নিষ্পন্ন করার চেষ্টায় আছে সেই সময় হই হই করে শ্মশান ঘাটে প্রবেশ করে আবুল কাশেম ও তাঁর দলবল। শ্মশানে দাহকার্য করতে নিষেধ করে। কিন্তু কুন্তী অনড় থাকে তাঁর সিদ্ধান্তে। সঙ্গে সঙ্গে কিরিচ আর বড়ো লাঠিসোঁটা নিয়ে মালোদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবুল কাশেমের দল। কেউ পালিয়ে বাঁচে, কেই মাটিতে লুটিয়ে কাংরাতে থাকে। শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে থাকে কুন্তী। শহীদুল এবং ফখরে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। একটানে কুন্তীর শরীর থেকে শাড়ি খুলে নেয় শহীদুল। গল্পকারের ভাষায়—

কুন্তীর পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। কুন্তীর নিতম্বে হাত দিল শহীদুল। এইসময় কোথেকে লাঠি হাতে দৌড়ে এল শান্তনু। ফখরে আলম এক বাড়িতে শুইয়ে দিল শান্তনুকে। শহীদুল ততক্ষণে কুন্তীর পেটিকোটের ফিতে ধরে টান দিয়েছে। গিঁট খেলে গেছে। পেটিকোট খুলে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে।^{৮০}

নিজের সন্ত্রম রক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে কুন্তী চোখ বুঝে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর কুন্তীর পেটিকোটটা সামনে নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠেন আবুল কাশেম। কারণ কুন্তীর মৃত্যুতে একসঙ্গে দুটো জয়ের রাস্তা তাঁর পরিষ্কার হয়ে গেছে। শ্মশান তাঁর দখলে এসেছে। আবার কুন্তীর মৃত্যুতে মালোপাড়ার সমস্ত ভোট তাঁর দিকে আসবে। আবুল কাশেমের ইচ্ছেপূরণ হয়েছে।

এইভাবে রাতসমাজ থেকে উঠে এসে উচ্চবর্গের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন কুন্তী। চেয়েছিলেন নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই অত্যাচারী আবুল কাশেমের দলের কাছে সে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেনি। তাঁর সর্বনাশ হওয়ার আগেই সে ভৈরব নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের সন্ত্রমকে বাঁচিয়েছে। তাই সেদিক দেখলে জয় কুন্তীরই হয়েছে। আর এইভাবেই গল্পকার জেলে সমাজের অসহায়তার ছবিকে যেমন তুলে ধরেছেন অনুরূপভাবে নারীদের প্রতিবাদকেও ভাষা দিয়েছেন।

‘সুবিমলবাবু’^{৮১} গল্পেও আমরা সমাজের উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষদের শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন ও অবহেলা ছবি খুঁজে পাই। গল্পে দেখা যায় জাত্যাভিমান অন্ধ অবিবাহিত সুবিমলবাবু নিম্নবর্গের মানুষদের একদমই সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি তাঁর বাবা হরিচরণ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও কুলীন ব্রাহ্মণ। তাই বাবার মতো তিনিও কৌলীন্যকে প্রাধান্য দিতেন। আর একারণেই তাদের বোনের বিবাহ হয়নি। তাই মনের দুঃখে তিনিও বিয়ে করেনি। কিন্তু শরীরের কামনা মেটাতে উচ্চশিক্ষিত এই অধ্যাপক শেষপর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন নিচু বর্গের মালতী জলদাসকে। অর্থাৎ শরীরের পিপাসা মেটানোর সময় জাতের কথা তাঁর মনে আসেনি। আর এইভাবেই দিনের পর দিন উচ্চবর্গের লালসার শিকার হয়েছেন নিম্নবর্গের নারীরা। তাই তাদের অন্তর্দাহকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন গল্পকার।

নারীরা যে চিরকালই ভোগের সামগ্রী এবং নিম্নবর্গের নারীদের ওপর উচ্চবর্গের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের মাত্রা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার প্রমাণ চিঠি^{৮২} গল্পটি। চিঠির ভঙ্গিতে লেখা এই গল্পে দেখা যায় মুসলিম ঘরের এক মেয়েকে তাঁর বাবা শিক্ষিত করে তোলার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে। চাষা-আবাদ করে অক্লান্ত পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ সে তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য খরচ করে। কিন্তু বাবার স্বপ্ন অধরাই রয়ে যায়। কারণ স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক হান্নান স্যারের কামনার শিকার হয় মেয়েটি। তাই শেষ পর্যন্ত এই অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি বাড়ির উঠানের আমগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর আগে মেয়েটি তার বাবাকে এই সমস্ত ঘটনার কথা একটি চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে যায়। হান্নান স্যারের লালসার শিকার হওয়ার পর অসহায় মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে যায়। মেয়েটি জানায় তার মনের গোপন বেদনার কথা—

গোটাটা দিন নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি বাবা। মা এবং তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি। মা ঘরকন্না ব্যস্ত। মাঠফেরত বাবা তুমি, ক্লান্ত—অবসন্ন। খেয়েই সেই পড়ন্ত বিকেলে তুমি ঘুমাতে গেলে।

মাকে বলতে চাইলাম সব কিছু। কিন্তু পারলাম না। লজ্জা, অপমান, আমার গলা টিপে ধরল।

একসময় মন বলল—তোমার চলে যাওয়া ভালো। তুমি না গেলে তোমার বাবা, মা ভাই, ভাই—এদের লজ্জার সীমা থাকবে না। তোমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হবে। টানা-হ্যাঁচড়ার প্রতিযোগিতায় তোমার কমজোর বাবা একদিন না একদিন হেরে যাবে। তোমার জীবন আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তাই তোমার চলে যাওয়াই উচিত। আমি মনের কথা শুনলাম। আমি চলে গেলাম বাবা। তুমি আমার ওপর রাগ কর না। মাকে বল, না কাঁদতে।^{৮৩}

শিক্ষক সমাজের কাণ্ডারী। কিন্তু তিনিই যখন হয়ে পড়েন সমাজের ধ্বংসযজ্ঞের হোতা, তখন আপনাপনি তাঁর আসল স্বরূপটি সকলের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। এই গল্পেও সেকথা প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি ফুটে উঠেছে এক অসহায় ও ধর্মিতা নারীর আত্মকথা। সে চেয়েছিল সুস্থভাবে বাঁচতে। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ তাঁকে থাকতে দেয়নি। তাই মা-বাবা, ভাইয়ের লজ্জার কথা মাথায় রেখে সে বেছে নিয়েছিল আত্মহত্যার পথ। আর এই পথ শুধুমাত্র মেয়েটির মৃত্যুকেই পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করে তা নয়, বিপন্ন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিও কটাক্ষ করে। মেয়েটির মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা বেদনা তাই শেষপর্যন্ত সমাজের ‘ভদ্রলোক’ নামধারী ভণ্ডদের মুখোশকেও আমাদের সামনে উন্মোচিত করে।

পাঁচ.

ব্রাত্য সমাজের কথাকার হরিশংকর জলদাসের বেশ কিছু গল্প নিয়ে আলোচনা করার পর একটি বিষয় পরিষ্কার— বিষয় বৈচিত্র্য ও কাহিনি বিন্যাসের



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দিক থেকে তাঁর গল্প অসাধারণ। তাই তাঁর গল্পে একদিকে যেমন ব্রাত্য সমাজের হাহাকার, বঞ্চনা, অবহেলা, শোষণ ও লাঞ্ছনা, তাঁদের প্রেম-অপ্রেম, পরকীয়া, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে নাগরিক সমাজের ছবিও চিত্রিত হয়েছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর জীবন। আর সেকারণেই অতিক্রান্ত সময়ের ব্যবধানে লেখা তাঁর ছোটগল্পগুলিতে বারেবারে তাঁর যাপিত জীবনে ঘটে যাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। প্রথাবিরোধী এই গল্পকার মূলত সামাজিক নির্যাতন, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তাঁর লেখালেখির মধ্যে দিয়ে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন—

...হাজার বছর ধরে প্রচলিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য মূলত আমি লেখালেখি করি। সমাজ-ধর্মে-আচরণে-মননে-শিক্ষায়-অর্থনীতিতে আমাদের মতো সম্প্রদায়ের মানুষজন বহুকালব্যাপী অবিরত লাঞ্ছনার শিকার হয়ে আসছে। আওয়াজ তোলার লোক এই দলিত সম্প্রদায়সমূহে নেই বললেই চলে। দু'একজন কথা বলতে চাইলে তাদের প্রলুব্ধ করা হয়েছে, ভয় দেখানো হয়েছে। আওয়াজ তোলার থেমে গেছে। আমি কম্প্রমাইজ করার লোক নই। কারণ আমি সখে লিখতে আসিনি। আমার পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে গেছে, তখন আমি হাতে কলম তুলে নিয়েছি। আমার মূলধন আমার আত্মবিশ্বাস, আমার মূলধন আমার সমাজ-অভিজ্ঞতা। এগুলোকে সম্বল করেই আমি লেখালেখি করি। আর হ্যাঁ, লেখালেখিতে মার কৌশল নেই। যা ভাবি এবং বিশ্বাস করি, তা-ই সহজ ভাষায় লিখবার চেষ্টা করি। আমার লেখায় কোনোরূপ ওপরচালাকি নেই। ভাষা নিয়ে কুস্তিও লড়ি না আমি।

মোন্দা কথা এটা যে, আমার বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে সামাজিক অবহেলার প্রতিবাদ করে যাচ্ছি আমার কথা সাহিত্যে। প্রতিবাদের মুণ্ডর থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি—কোনটাই রেহাই পাচ্ছে না।^{৭০}

আলোচিত গল্পগুলির মধ্যেও গল্পকার হরিশংকর জলদাসের এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। তাই তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে ব্রাত্যসমাজের আত্মকথন।

দলিত সমাজের প্রতিনিধি হরিশংকর জলদাস তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়ে যে শুধুমাত্র জেলে সমাজের কথাকেই তুলে ধরেছেন এমনটি নয়। সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষদের বৈচিত্র্যময় জীবনের কথাও উঠে এসেছে। তাদের একাকীত্ব, অসহায়তা, প্রেম-অপ্রেম, হিংসা, আনন্দ, দুঃখ, কষ্টকেও তিনি ভাষা দিয়েছেন। মানবমনের জটিল কুটিল নানা অন্তর্দ্বন্দ্বকে তিনি অসাধারণ শিল্পকুশলতার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে। তাই দেখা যায়, তাঁর সাম্প্রতিককালের গল্পগুলিতে জেলেজীবন প্রায় নেই বললেই চলে। উদাহরণ হিসেবে 'হরকিশোরবাবু', 'দেহ', 'রতন', 'মাধবীলতা', 'ম্যাডাম', 'কীরকমভাবে বেঁচে আছি', 'উস্টা', 'রমা বৌদি', 'ভালোবাসার পিঁড়ি', 'পরম্পরা' ইত্যাদি ছোটগল্পের নাম করা যায়। গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে সমকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হোক বা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি সর্বত্রই যৌনতার উপস্থিতি লক্ষণীয়। উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন সমাজের সর্ব স্তরেই এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। হরিশংকর জলদাসের গল্পও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। তবে তা শুধুমাত্র নারী শরীরের বর্ণনা বা উদ্যম শিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর গল্পে যৌনতা তীক্ষ্ণ মনননির্ভর। মূলত যৌনতার আড়ালে তিনি দেখাতে চেয়েছেন পুরুষতান্ত্রিকতা, ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা, নারী স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে। নরনারীর যৌন জীবনের কারুণ্য বর্ণনা তাঁর গল্পে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান আধুনিক কথাশিল্পে তা অপরিহার্য বিষয়। আর আধুনিক জীবনকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যেই নরনারীর যৌন চেতনাকে নন্দনতান্ত্রিক কলাকৌশলে তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। শিল্প চেতন্যের নানাদিক দিক থেকে হরিশংকর জলদাস তাঁর গল্পের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। হরিশংকর জলদাস তাঁর এক সাক্ষাৎকারে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও যৌনতার বিষয়গুলি তাঁর লেখার মধ্যে উঠে আসার প্রয়োজনীয়তার কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন—

...মানুষের জীবনের প্রধান অরি হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। কামকে মানুষের প্রধান শত্রুও বলতে পারেন, আবার মানুষের জীবনের প্রধান চাহিদাও বলতে পারেন। যদিও আমরা খাদ্যকে আমাদের প্রধান চাহিদা হিসেবে বলেছি। মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে বিপন্ন থাকে তখন কাম দ্বারা তাড়িত হয়। শুধু মানুষ কেন, পিঁপড়া থেকে শুরু করে তিমি ও হাতি পর্যন্ত সবাইই কিন্তু যৌনজীবন বলে একটা জীবন আছে। তাদের মধ্যে যৌনতা বলে একটা ব্যাপার আছে। কামে উদ্দীপিত হওয়ার একটা শিহরণ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আছে। আর মানুষের মধ্যে তো আছেই। তো নারী-পুরুষের এই যে পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ, সেটা একেবারে সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। এবং সেটা মানুষের জীবনের প্রধান একটি অনুষঙ্গ বটে। মানুষের জীবনের প্রধান অনুষঙ্গকে এড়িয়ে কোনো সাহিত্য রচিত হয় না।...ভিক্টোরিয়ান যুগে সাহিত্যিকরা আড়াল দিয়ে, রাখঢাক করে সাহিত্য রচনা করেছেন। নারী-পুরুষের যৌনজীবনকে তাঁরা, মানে সে সময়ের ইংলিশ সাহিত্যিকরা উপস্থাপন করতে চাননি। সেই সময়েও কিন্তু নানা রকমের লেখা লিখিত হয়েছে। আড়ালে ইঙ্গিতে তাঁরা কিন্তু যৌনজীবনের কথা বলেছেন।...রবীন্দ্রনাথও যৌনজীবনের কথা বলেছেন, তবে সেটা একটা পরিশীলিত ভাষার মধ্যে দিয়ে। মানবজীবনের যৌনতাকে, বাংলা সাহিত্যে একেবারে উন্মোচিত করে দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ফ্রেড তো মানব সভ্যতাকে একটা জোর ধাক্কাই দিয়েছেন তাঁর তত্ত্ব দিয়ে। খাদ্য ছাড়া যেমন মানুষের জীবন চলে না, তেমনি করে কাম ছাড়া মানুষের জীবন চলে না। কামহীন মানুষ পৃথিবীতে কম আছে। দেখা যায়, যে সাধু মঠে বসে বা মন্দিরে বসে মানুষের উপদেশ দিচ্ছে সেই সাধুও সামনে সমবেত কোনো যৌনবতী নারীর প্রতি বাক্যচোখে তাকাচ্ছে। এ বিষয়টাকে যারা অস্বীকার করে তারা প্রচণ্ডভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়।^{৭১}

সাহিত্য যে সমাজের দর্পণ— এই চূড়ান্ত সত্য আরও একবার প্রমাণিত হল হরিশংকর জলদাসের এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে। তাই দেখা যায় তাঁর গল্পের পরতে পড়তে ছড়িয়ে রয়েছে যৌনতার অনুষঙ্গ। 'কোটনা', 'লুচা', 'প্রতীক্ষা', 'ভাঙন' গল্পগুলিই তার প্রমাণ। গল্পগুলিতে দেখা যায় এই আদিম প্রবৃত্তি কখনো মানুষের দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছে, আবার কখনো এই আদিম প্রবৃত্তিকে মেটাতে নারী-পুরুষ বেছে নিয়েছে একে অন্যকে। এমনকি পারিবারিক সম্পর্কও এক্ষেত্রে তুচ্ছ হয়ে গেছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কখনো তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সতী সাধবী স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আবার কখনো সম্ভোগসুখে অক্ষম স্বামীর পরিবর্তে স্ত্রীর কাছে শ্বশুরমশাইয়ের প্রতি তীব্র যৌন আসক্তিও প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে একাকীত্ব, অসহায়তা, ঘৃণার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক যখন সম্পূর্ণ তলানিতে এসে ঠেকেছে তখন তারা নিজেদের শারীরিক চাহিদা মেটাতে বেছে নিয়েছে তৃতীয় কোনো পক্ষকে। তাই সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে চলে আসা নারী-পুরুষের এই আকর্ষণকে কোনোমতে উপেক্ষা করা যায় না। কখনো আবার আদিম প্রবৃত্তির পিপাসা মেটাতে তাদের ভোগের স্বীকার হয়েছে নারীরা। হরিশংকর জলদাসের 'একদা এক ইলিশ', 'চিঠি', 'দইজ্যা বুইজ্যা', 'চরণদাসী', 'দুলাই এবং কয়েকজন' গল্পে সেই সেই অসহায় নারীদের ওপর অত্যাচারের ছবি ফুটে উঠেছে।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে যৌনতার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে। এর কারণ জানাতে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি বা যাদের নিয়ে লিখি, যে সম্প্রদায় বা যে অপাণ্ড্যেয় মানুষদের নিয়ে লিখি, তাদের বিনোদনের প্রধান উপায় কিন্তু এই যৌনজীবন, যৌনতা। তারা মদ খেয়ে উল্লাস করে। কোথাও বেড়াতে গিয়ে টাকা খরচ করবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের মনের



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

মধ্যে যখন বিনোদন জাগে, তখন সে বিনোদনের পরিসমাপ্তি ঘটে কোনো নারীর সঙ্গে উপগত হয়ে। এ জন্য তাদের জীবন থেকে যৌনতাকে বিযুক্ত করা কখনো সম্ভব নয়। তারা খাদ্যের সঙ্গে যৌনতাকেও প্রধান অবলম্বন মনে করে। এবং সে জন্য আমার কথাসাহিত্য যৌনতাবিযুক্ত নয়।... আমার কথাসাহিত্যে যৌনতা একটা জায়গা নিয়ে আছে।^{৮৫}

গল্পকার হরিশংকর জলদাসের বক্তব্য অনুযায়ী সমাজের অপাণ্ডিত্য মানুষেরা তাদের মনে জেগে ওঠা বিনোদন বা আদিম প্রবৃত্তির পরিসমাপ্তি ঘটায় কোনো নারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে। অর্থাৎ সেই নারী স্ত্রী ও হতে পারে, আবার অন্য কেউ হতে পারে। হরিশংকর জলদাসের গল্পে তাই দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে গিয়েও নারী-পুরুষের মধ্যে একাধিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ পেয়েছে, যার বেশিরভাগই বিনোদনমূলক বা যৌনতাকেন্দ্রিক।

হয়।

ছোটগল্পের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে হরিশংকর জলদাস যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। খুনি, পতিতা, পাগলি, মুচি, মেথর, কোটনা, দালাল, নিচু স্তরের জেলে, শিক্ষক, গৃহিণী, দোকানদার, শিক্ষিত লোক, এমনকি মান্যগণ্য ব্যক্তিরও তাঁর গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠেছে। বহুবিধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বিশিষ্ট ছোটগল্পকার হরিশংকর জলদাস চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। বিষয়ের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি বাস্তব রূপ লাভ করেছে। নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-অপ্রেম, ক্রোধ-অভিমান, সামাজিক বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার কথা এবং সামাজিক নানা অসংগতির কথা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেন— ‘আমি দলিত সমাজের একজন’^{৮৬}। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা সেই সমাজেরাই একজন হয়ে উঠেছে।

তবে তাঁর গল্পের চরিত্ররা যে শুধুমাত্র জেলেজীবন থেকেই উঠে এসেছে এমনটি নয়। আধুনিক নরনারীও তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। এপ্রসঙ্গে হরিশংকর জলদাস তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

জলপুত্র আর দহনকাল, জলদাসীর গল্প আর লুচা যখন লেখা হল আমার বিরুদ্ধে ধূয়া উঠল—জেলেজীবন ছাড়া আমার আর কিছু জানা নেই। ওতেই হরিশংকর বৃত্তাবদ্ধ হয়ে থাকবে। কথাটা কানে আসার পর আমি কসবি, রামগোলাম আর মোহনা লিখলাম।

আমার মনে হল, গল্পেও জানান দিতে হবে আমি জলজীবনের বৃত্তে আবদ্ধ নই। তা ছাড়া আমার জীবনাভিজ্ঞতার ঝড়ি তো ভরপুর।

তাই সেই অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যধরনের গল্প লেখা শুরু করলাম। আমার ইদানীংকালের গল্পগুলো তারই ফসল হয়তো।^{৮৭}

তাই হরিশংকর জলদাসের গল্পের চরিত্ররা আজ আর কেবলমাত্র জেলে সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষেরাই তাঁর গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্পের চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে হরিশংকর জলদাস তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

যখন আমার ভেতরে তাগিদ আসে যে, এখন আমার কিছু লেখা দরকার, তখন লিখতে বসি। গল্প-উপন্যাস পড়তে গিয়ে পাঠক প্রথমেই কাহিনি খোঁজেন। আর কাহিনি দাঁড়িয়ে থাকে চরিত্রের ওপর। তাই উপন্যাসে বা গল্পে চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। স্ববিরোধিতা, স্বার্থপরতা, দ্বিচারিতার অর্থাৎ বাহির আর ভেতরের বৈপরীত্য, একটা চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলে। একটি চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমি তার চারপাশের ভূগোল-ইতিহাসকে, তার দাঁড়িয়ে থাকার জায়গাটি এবং তার ভেতর-বাহিরের রূপবৈচিত্র্যটি খেয়াল রাখি।^{৮৮}

গল্পকার হরিশংকর জলদাসের গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে তাই এই বিষয়গুলি ফুটে উঠতে দেখা যায়। আর সেকারণেই বাস্তব সমাজ থেকে সৃষ্ট এই চরিত্ররা হয়ে ওঠে অনেক বেশি প্রকট ও বাস্তবমুখী।

সাত.

ছোটগল্পকার হরিশংকর জলদাসের গল্পগুলি নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করার পর একথা বলা যায় ব্রাত্য সমাজ তাঁর গল্পের প্রধান অনুষঙ্গ। তাই সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষেরা তাঁর গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাদের অন্তর্দাহকে ভাষা দিয়েছেন গল্পকার। তারা হয়ে উঠেছে আমাদের কাছের মানুষ। বহুবিধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর জীবন। আর সেকারণেই অতিক্রান্ত সময়ের ব্যবধানে লেখা তাঁর ছোটগল্পগুলিতে বারবারে তাঁর যাপিত জীবনে ঘটে যাওয়া বহুবিধ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর গল্পে ব্রাত্য সমাজের কথা ফুটে উঠলেও নাগরিক সমাজকেও তিনি উপেক্ষা করেনি। তাই আধুনিক নরনারীর মনের জটিল কুটিল নানা দ্বন্দ্বকে তিনি গল্পের বিষয় করেছেন। উঠে এসেছে দাম্পত্য সংকটের কথা, নারী-পুরুষের জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংস্রতা, আদিম যৌনতা, পুরুষতান্ত্রিকতা, ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা, নারী স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়। তাই বলা যায় ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য ও চরিত্রসৃষ্টির অভিনবত্বে গল্পকার হরিশংকর জলদাস কেবলমাত্র বাংলাদেশের ছোটগল্প নয়, বৃহত্তর বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার।

তথ্যসূত্র

১. জলদাস, হরিশংকর, *গল্পসমগ্র-১*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০১৬
২. মুহাম্মদ, মহি, *হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. জলদাস, হরিশংকর, *কৈবর্তকথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৯
৬. জলদাস, হরিশংকর, ‘লুচা’, *গল্পসমগ্র-১*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা. ১১৫
৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ১২৩
৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ১২৪
৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ১২৪
১০. ঐ, পৃষ্ঠা. ১২৪
১১. ঐ, পৃষ্ঠা. ১২৪
১২. ঐ, পৃষ্ঠা. ১২৫
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ১২৫



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

১৪. এ. পৃষ্ঠা. ১২৫
১৫. এ. পৃষ্ঠা. ১২৫
১৬. এ. পৃষ্ঠা. ১২৬
১৭. এ. পৃষ্ঠা. ১২৬
১৮. জলদাস, হরিশংকর, 'প্রতীক্ষা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৭
১৯. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৩
২০. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৩
২১. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৪
২২. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৪
২৩. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৪
২৪. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৪
২৫. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৪
২৬. জলদাস, হরিশংকর, 'ভাঙন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৫
২৭. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৮
২৮. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৮
২৯. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৮
৩০. এ. পৃষ্ঠা. ১৪৯-১৫০
৩১. এ. পৃষ্ঠা. ১৫০
৩২. এ. পৃষ্ঠা. ১৫০
৩৩. এ. পৃষ্ঠা. ১৫০
৩৪. এ. পৃষ্ঠা. ১৫০
৩৫. এ. পৃষ্ঠা. ১৫০
৩৬. এ. পৃষ্ঠা. ১৫০-১৫১
৩৭. এ. পৃষ্ঠা. ১৫৩
৩৮. এ. পৃষ্ঠা. ১৫৩
৩৯. জলদাস, হরিশংকর, 'কীরকমভাবে বেঁচে আছি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩১৫
৪০. এ. পৃষ্ঠা. ৩১৮-৩১৯
৪১. এ. পৃষ্ঠা. ৩১৯
৪২. এ. পৃষ্ঠা. ৩১৯
৪৩. এ. পৃষ্ঠা. ৩১৯
৪৪. এ. পৃষ্ঠা. ৩১৯-৩২০
৪৫. এ. পৃষ্ঠা. ৩২০
৪৬. এ. পৃষ্ঠা. ৩২০
৪৭. এ. পৃষ্ঠা. ৩২০
৪৮. এ. পৃষ্ঠা. ৩২১
৪৯. এ. পৃষ্ঠা. ৩২১
৫০. জলদাস, হরিশংকর, 'কোটনা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১
৫১. এ. পৃষ্ঠা. ১২
৫২. এ. পৃষ্ঠা. ১২
৫৩. এ. পৃষ্ঠা. ১৪
৫৪. এ. পৃষ্ঠা. ১৭
৫৫. এ. পৃষ্ঠা. ১৯
৫৬. এ. পৃষ্ঠা. ১৯
৫৭. এ. পৃষ্ঠা. ১৯
৫৮. এ. পৃষ্ঠা. ২০
৫৯. জলদাস, হরিশংকর, 'একটি বর্ণচোরা পরামর্শ', কৈবর্তকথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ—
ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা. ৫৩
৬০. জলদাস, হরিশংকর, 'ভূমিকা', পূর্বোক্ত
৬১. এ.
৬২. জলদাস, হরিশংকর, 'কোটনা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২২
৬৩. এ. পৃষ্ঠা. ২২
৬৪. জলদাস, হরিশংকর, 'দইজ্যা বুইজ্যা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৩
৬৫. এ. পৃষ্ঠা. ২৬



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

৬৬. এ. পৃষ্ঠা. ২৬
৬৭. এ. পৃষ্ঠা. ২৬
৬৮. এ. পৃষ্ঠা. ২৮
৬৯. জলদাস, হরিশংকর, 'দুলারি এবং কয়েকজন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯০
৭০. এ. পৃষ্ঠা. ৯৩
৭১. এ. পৃষ্ঠা. ৯৬
৭২. এ. পৃষ্ঠা. ৯৮
৭৩. জলদাস, হরিশংকর, 'কুস্তীর বস্ত্রহরণ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩০৪
৭৪. এ. পৃষ্ঠা. ৩০৭
৭৫. এ. পৃষ্ঠা. ৩০৮
৭৬. এ. পৃষ্ঠা. ৩০৮
৭৭. এ. পৃষ্ঠা. ৩১২
৭৮. এ. পৃষ্ঠা. ৩১২
৭৯. এ. পৃষ্ঠা. ৩১৩-৩১৪
৮০. জলদাস, হরিশংকর, 'সুবিমলবাবু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৮
৮১. জলদাস, হরিশংকর, 'চিঠি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৭
৮২. এ. পৃষ্ঠা. ১৩৬
৮৩. মুহাম্মদ, মহি, হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা.
৮২-৮৩
৮৪. এ. পৃষ্ঠা. ৮৯-৯০
৮৫. এ. পৃষ্ঠা. ৯০
৮৬. এ.
৮৭. এ. পৃষ্ঠা. ৪৩
৮৮. এ. পৃষ্ঠা. ৬৭